আরশিনগর

বাউল ফকির উৎসবের পত্রিকা

তৃতীয় সংখ্যা, ২০১৩

বাউল ফকির উৎসব

সহজ ধারা সঙ্গ কর

আরশিনগর

তৃতীয় বর্ষ

আরশিনগর
তৃতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১৩

© বাউল ফকির উৎসব কমিটি

প্রকাশক : বাউল ফকির উৎসব কমিটি

প্রচ্ছদ : অমিত রায়

অক্ষরবিন্যাস : সাইনোস্যুর

মুদ্রক : ম্যাপেল প্রিন্টিং হাউস,
শক্তিগড়,
কলকাতা - ৭০০ ০৩২

সম্পাদক : মৌসুমী ভৌমিক
সহ সম্পাদনা : সাত্যকি ব্যানার্জি
স্রোতা দত্ত

অরূপ মুখার্জিকে
মনে রেখে

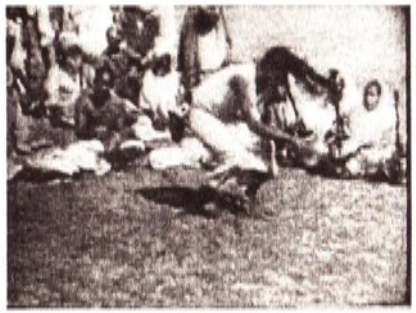

এই ছবিগুলি (সম্ভবত ১৯৩২ সালে) কেন্দুলিতে ডাচ্ সঙ্গীত-গবেষক আর্নল্ড বাকে-র তোলা ফিল্ম-এর কয়েকটি স্থির চিত্র। সৌজন্য : ARCE, গুড়গাঁও এবং ব্রিটিশ লাইব্রেরি, লন্ডন।
সূত্র : The Travelling Archive.
www.thetravellingarchive.org

সূচীপত্র

আমাদের কথা ১

লালন : মানবজমিন আবাদের মরমি কৃষক
আবুল আহসান চৌধুরী ৫

হাওরের লিলুয়া বাতাসে ভেসে আসা গান
সুমনকুমার দাশ ২৩

মালজোড়া গান গাওন নিয়া একটি আন্দুনামা
প্রদীপ কুমার পাল ৩৫

মা ফতেমার সাধের ছেলে পড়ে কেন ধূলাতে :
শিয়া শোকগাথার সন্ধানে
ঈঙ্গিতা হালদার ৪৭

কোথায় রেকর্ড করব
সুকান্ত মজুমদার ৬৩

কবীরের সঙ্গে পথচলা
মূল ইংরেজি : শবনম ভিরমানি
অনুবাদ : কবীর চট্টোপাধ্যায় ৭৫

লালন ভেড়োর দিন গিয়াছে?
একটি নাট্যকল্পে কুষ্টিয়া ও লালন
সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় ৯১

পরিশিষ্ট :

ব্রজলীলা ও মথুরালীলা সঙ্গীত
শ্রীরাধাশ্যাম দাস প্রণীত ১১৩

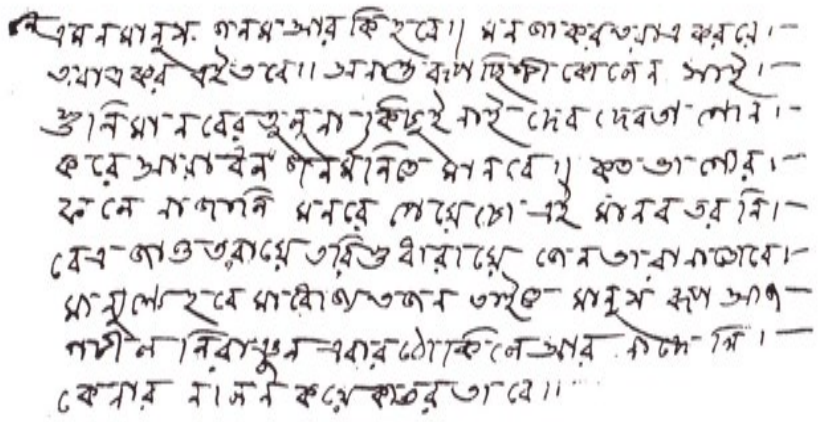

লালনের গানের খাতা থেকে।
সৌজন্য : শক্তিনাথ ঝা।
সূত্র : www.lalan.org

আমাদের কথা

আমাদের বাউল ফকির উৎসবের এটা অষ্টম বর্ষ, *আরশিনগর* পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা। প্রতি বছর জানুয়ারির শুরুতে মেলা হয়, মাত্র দু'টো দিন; তারপর সব গুটিয়ে ফেলার পর, সমস্ত হিসেব নিকেশের পর কথা হয়, অন্তত বন্ধুদের একটা দল বলে, এই হল, আর নয়। কিছুটা অভ্যেসবশে বলে, কিছুটা সিরিয়াসলিও। অনেক হিসেব মেলে না, কী করে কী হল, কেন কী হল না, পরে ভেবে এসব আর মনে করা যায় না। এই বেহিসাবী ভাবটাই অনেককে ভাবায় — আর একবার এতখানি chaos? থাক বরং। তবু বছর তার নিজের নিয়মে এগিয়ে চলে এগিয়ে চলে আর উৎসবের উদ্যোক্তরা প্রায় সবাই যেহেতু বন্ধু, তাই কারণ ছাড়াই এখানে ওখানে দেখা হয়, আর নানান কথার মধ্যে মেলার কথাও হয়। তারপর একটা সময় পাড়ার লোকেরা, বাইরের বন্ধুরা জিজ্ঞেস করতে শুরু করেন, এবার মেলা তাহলে কবে পড়ছে? এই কথা, কথা থেকে কথা, তার থেকে ভাবনা, তর্ক, কাজ — ক্রমে কাজ। কী করে যেন মেলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়, যাবতীয় বেহিসাবের ভিতর থেকেই।

চরম বেহিসাবের ভিতরে এবারের উৎসবের প্রস্তুতি। কী করে কী হল আর কী কী হল না, এই উত্তর পাবার চেষ্টা করাটাই বৃথা মনে হয় যখন ভাবি যে অরূপ মুখার্জি এবার মেলার কাউন্টারে ওর নীল অ্যানোর‍্যাক পরে বসে সিডি আর ক্যালেন্ডার বিক্রি করবে না। আমাদের বন্ধু অরূপ, বাউল ফকির উৎসবের প্রথম দিন থেকে যার উপস্থিতি taken for granted ছিল, তার না থাকাটা এতটাই অস্বাভাবিক যে ধরে নিতে হয় অরূপ আছেই, এই কোথাও গেছে, অথবা এইবার মেলা একটু দূর থেকে দেখতে চাইছে, কারণ নৈকট্যে কষ্ট বাড়ে। হয়ত তাই-ই। দূর থেকেই দেখছে হয়ত। যে গান নিয়ে এই উৎসব, সেই গান তো জীবন-মৃত্যুকে থাকা-না-থাকার সাধারণ হিসেব দিয়ে দেখতে বারণ করে। 'শেওলা ভরা নদীর মাঝে সাঁতার দিলি কী কারণ/স্রোতও নাই জীবনও নাই মিছে রে তোর জলভ্রমণ'।

Chaos আর order-এর একটা সম্পর্কের কথা একবার সমীর সেনগুপ্ত লিখেছিলেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে। লিখেছিলেন, 'ওই যে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতাকে এড়িয়ে গিয়ে সমস্ত নির্মোক মোচন করে একা একা নগ্নপদে গিয়ে অসীমের মুখোমুখি দাঁড়ান, এই ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত শক্তিকে অন্য সকলের চেয়ে আলাদা করে দেয় — আমরা বুঝতে পারি ওর জীবনের সমস্ত বাউণ্ডুলেপনার তলায় তলায় বহমান অন্তর্লীন শৃঙ্খলার বোধ, যে শৃঙ্খলা ওকে কখনও বিচ্যুতি ঘটাতে দেয়নি কবিতায় — যত নেশা করেই লিখুক, যত উচ্চণ্ড রাগ থেকেই লিখুক, কবিতার মধ্যে ছন্দোপতন হত না কখনও। ... ও হয়ত শুনতে পেয়েছিল সেই ছন্দ, যা সমস্ত বিশৃঙ্খলার অন্তরালে অনাহত বেজে চলেছে ...।'

আমরা নেহাতই সামান্য জীব, তাই বাহিরের বিশৃঙ্খলাকে ভেদ করে অন্তরালের ছন্দে পৌঁছতে পারি না। তবু চেষ্টাটুকু করতে তো বাধা নেই? সেই যুক্তিতেই আমাদের মেলা, আমাদের উৎসব হয় প্রতি বছর। যতদিন সাধ আছে, হোক না! সাধ্যের সীমাবদ্ধতাকে পরোয়া না করেই যখন সাধ জাগতে পারছে এখনও? আমাদের সাধ্য যে কতটা কম, তার ছাপে থেকেই যায় আমাদের প্রতিটা পদক্ষেপে। এই *আরশিনগর* পত্রিকাও তার বাইরে নয়।

তবু অন্যবারের মতন এবারও *আরশিনগর*-এ আমরা চেষ্টা করেছি, যে গান নিয়ে এই উৎসব, সেই গান, সেই সুর, সেই ভাব কীভাবে নানা মনে, নানা মননে আর লিখনে বিম্বিত, প্রতিবিম্বিত হয়, তাকে ধরার। এই মেলায় বাউল ফকিররা আসেন, শ্রোতা আসেন, ক্রেতা বিক্রেতা আসেন, এমনিই আসেন কত মানুষ। মাঠের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটু দাঁড়িয়ে যান। বিভিন্ন স্থান-কাল-সময়ের ভাবনা আর স্মৃতি এসে জড়ো হয় এখানে, এই শক্তিগড়ের কলোনির মাঠে, যার আশেপাশে মানুষ এসে বসতি করেছিল অনেক কাল আগে, যখন তার দেশ ভাগ হয়ে গেছিল, আর সে ভাঙা ঘর ছেড়ে আসবার সময় সঙ্গে করে আর কিছু না পারুক, কিছু সুর-স্বরের রেশ নিয়ে এসেছিল। এই উৎসব কারো মনে সেই সুরের স্মৃতিকে জাগিয়ে দেয়। আবার ঠিক তার বিপরীতে বসে কোনো তরুণ এই প্রথমবার বাউলগান শোনে। কেউ শোনে আর দেখে আর ভাবতে চায়, বুঝতে চায় এসবের মানে। এই গান নিয়ে শুধু ভাবে না, ভাবনা আরো অন্য গানে চলে যায়, যা এই গান আর এই জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়তো। সরাসরি অথবা ঘুরপথে। একই গান একজন একভাবে বোঝে, আর একজন আর একভাবে। আর এই oral tradition বা মৌখিকতার সংস্কৃতিতে, কথা থেকে কথা তৈরি হয়, মিথ থেকে মিথ, গল্প তৈরি হয়ে যায় এইসব গান আর গানের মানুষদের নিয়ে। এইসব মেলেটেলা তেমনই এক ক্ষেত্র যেখানে নতুন গান আর গল্প তৈরি হয় আর পুরনো গান-গল্প নতুন করে বলা হয়।

আরশিনগর-এর সীমিত পরিসরে আর আমাদের সীমিত সাধ্য নিয়ে আমরা এই অনেক স্বর আর সুরকে কিছুটা ধরার চেষ্টা করেছি। অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী আমাদের জন্য আগেও লিখেছেন, এবারেও তিনি লালনের গানের সাহিত্যিক মূল্যায়ন করে একটি লেখা পাঠিয়েছেন। তিনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ, মূলত লালন-চর্চায় দীর্ঘদিন সময় কেটেছে তাঁর, তাই তাঁর লেখা দিয়েই *আরশিনগর*-এর এই সংখ্যা শুরু হল। নাট্য-গবেষক, লেখক এবং অভিনেতা সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ও লিখেছেন লালন সাঁইকে নিয়ে, তবে তাঁর দৃষ্টিকোণ ভিন্ন, লক্ষ্যও ভিন্ন। তিনি লালনকে নিয়ে নাটক করেছিলেন *Man of the Heart*, সেই সূত্রে লালনকে জানতে কুষ্টিয়ায় যাওয়া এবং বার বার যাওয়া এবং ফিরে আসা তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি নিয়ে। কুষ্টিয়ার উপস্থিতি আমাদের পত্রিকার পাতায় যেমন — আবুল আহসান চৌধুরী কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপান করেন — তেমনি কুষ্টিয়া থেকে এবার মেলায় গাইতে আসবেন টুনটুন ফকির ও তাঁর দল এবং নজরুল ফকির।

সীমিত সাধ্যের কথা হচ্ছিল। সাধ থাকলেও যে অনেক সাধই পূরণ করা যায় না। গত ২০০৯ থেকে তিন বছর ধরে সিলেট থেকে আমাদের উৎসবে শিল্পীরা এসেছেন, আমাদের মেলা চন্দ্রবতী রায় বর্মণ, সুষমা দাশ, রণেশ ঠাকুরের মতন শিল্পীর অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ হয়েছে। এবার আমাদের পক্ষে সিলেট থেকে শিল্পীদের নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি নানা প্রতিকূলতার জন্য। কিন্তু এতদিন ধরে সিলেট থেকে শিল্পীরা আসছেন, কোথা থেকে আসছেন তাঁরা, কোন ভাটি, কোন

মাটিতে তাঁদের গানের জন্ম — এ নিয়ে এবার সিলেটের লেখক-গবেষক সুমন কুমার দাশ লিখেছেন *আরশিনগর*-এর জন্য। বাংলাদেশের সিলেটের সংলগ্ন অঞ্চল ভারতের কাছাড়; সেখানে শিলচরে প্রদীপ কুমার পাল লোকগানের একনিষ্ঠ শ্রোতা এবং চিন্তক। শিলচর থেকে আমাদের অনুষ্ঠানে শিল্পী এসেছেন অন্যান্য বছর, তাও প্রদীপদার সূত্রেই। তিনি এবারের পত্রিকার জন্য তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় মালজোড়া গানের ওপর একটি লেখা লিখেছেন। এতে আমরা শুধুমাত্র অজানা অনেক গান, গানের ধারা, গানের ইতিহাস সম্পর্কেই জানতে পারছি, তা নয়, প্রদীপদার ভাষা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে যে 'কলকাত্তাইয়া' ভাষাতেই সীমাবদ্ধ নয় আমাদের বাংলা ভাষা; তার বিস্তৃতি অনেক দূর পর্যন্ত, সে অনেক শব্দ, ধ্বনি, বাচনকে ধারণ করে।

আমরা বাংলার বাইরের এক বিশাল ভূমিতে ভক্তি-সুফি ধারার গানের বহু যুগের যে বহতা ট্র্যাডিশন, তাকে জানার প্রয়াসে গত বছর মধ্য প্রদেশের কবীর সাধক ও শিল্পী প্রহ্লাদ সিং টিপানিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম আমাদের মেলায় এবং তাঁর গান শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই ট্র্যাডিশনকে চালিয়ে যাবার লক্ষ্যে এবার আমরা উত্তর প্রদেশের রামপুরের প্রখ্যাত কাওয়াল, মহম্মদ আহমেদ ওয়ারসি এবং তাঁর দলকে মেলায় আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ওঁরা মূলত পারস্যের সুফি ধারার কবিদের, যেমন আমির খুসরো, মওলানা রুমি, সাদী — এঁদের রচনা গাইবেন।

এদিকে এক দশকের উপর সময় ধরে কবীরকে নিয়ে চর্চা করছেন শবনম ভিরমানি। তাঁর ডকুমেন্টারি ফিল্ম *কবীরা খড়া বাজার মেঁ*-এর সূত্রেই আমরা অনেকে প্রহ্লাদ সিং টিপানিয়ার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই। শবনম শুধু ফিল্ম বানান না, তিনি নিজে কবীর দ্বারা এতটাই প্রভাবিত যে কাজ করতে করতে তিনি প্রহ্লাদজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি কবীরের সঙ্গে তাঁর পথচলার কথা লিখেছিলেন ইংরেজিতে, ২০০৮ সালে, *Seminar* পত্রিকায়। তারই বাংলা অনুবাদ আমরা রাখছি এবারের *আরশিনগর*-এ, অনুবাদ করেছেন তরুণ লেখক-গায়ক কবীর চট্টোপাধ্যায়।

ধর্ম বলতে রাজনীতি ছাড়াও জীবনধারা, সংস্কৃতি, মিথলজি — কত কিছুই তো বোঝায়। বাংলায় ইসলাম আসবার সঙ্গে সঙ্গে কত গান, কত গল্প, গানের ধারা এসেছে এখানে, কত নতুন ভাবনার জন্ম হয়েছে, নতুন সঙ্গীত আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন জারী গান। যেমন আমাদের মেলার অত্যন্ত জনপ্রিয় শিল্পী মুর্শিদাবাদের গোলাম ফকিরের বাংলা কাওয়ালি। ঈপ্সিতা হালদার আমাদের একেবারেই অজানা একটি গান এবং পাঠের ধারা — বাংলা নওহা, অর্থাৎ কারবালা-বিষয়ক শিয়া সম্প্রদায়ের শোকগাথা — নিয়ে গবেষণা করছেন কিছুকাল ধরে; তিনি তাঁর ফিল্ডওয়ার্কের অভিজ্ঞতা এবং তার থেকে লব্ধ জ্ঞান নিয়ে আমাদের জন্য একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, তাতে আমরা চেনা জগতের বাইরে এক অন্য জগতকে একটুখানি স্পর্শ করার সুযোগ পাচ্ছি।

সুকান্ত মজুমদার বাউল ফকির উৎসবের একনিষ্ঠ কর্মী। পেশায় সাউন্ড রেকর্ডিস্ট সুকান্ত গত বছর *আরশিনগর* শব্দ শোনা নিয়ে লিখেছিলেন, এবার লিখেছেন শব্দ ধারণ করা, অর্থাৎ রেকর্ড করা নিয়ে। এমনিতে, আমাদের বেশির ভাগ সাধারণ মানুষেরই রেকর্ডিং-এর জটিল জগতকে জানার তেমন কোনো সুযোগ তো সহজে ঘটে না। অথচ, আমরা এই মেলায় প্রথম থেকেই গান শোনা, শোনানো এবং রেকর্ড করার গুণগত দিকটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আসছি। সেই কারণেই সুকান্তর লেখা আমাদের এই পত্রিকার জন্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। শুধু আমাদের পত্রিকার

জন্যই নয় অবশ্য; বাংলায় এমন বিষয়ে লেখা বড়ো একটা তো চোখে পড়ে না।

গত বছর আমরা আলাদা করে দীন দ্বিজদাসের দুষ্প্রাপ্য একটি জীবনী ছেপেছিলাম, এবার *আরশিনগর*-এর 'পরিশিষ্ট' হিসেবে আমরা রাধাশ্যাম দাসের ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত *ব্রজলীলা ও মথুরালীলা সঙ্গীত* গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ করছি। সঙ্গে রাধাশ্যাম দাসের একটি ছোটো পরিচিতিও থাকছে।

এবার আরশিনগরে আমরা শুধু লেখা নয়, কিছু ছবিও রাখলাম। শুধু টেক্সট নয়, ইমেজ-ও। তার কারণ আমরা মেলায় গানের রেকর্ডিং বিক্রি করি, বই বিক্রি করি, অর্থাৎ টেক্সট এবং সাউন্ড-এর মাধ্যমে মেলার একটা অভিজ্ঞতা আমরা দেবার চেষ্টা করি। কিন্তু যদি একটু ইমেজও রাখা যেত, তাহলে অভিজ্ঞতাটা হয়তো আর একটু পূর্ণতা পেত। সেই কথা ভেবেই এবার লেখার সঙ্গে একটি করে ছবি রেখেছি আমরা। প্রতিটা ছবিই তার নিজের মতন করে কথা বলবে, বুঝিয়ে বলার তেমন প্রয়োজন নেই। শুধু শুরুতে ১৯৩২-এ হল্যান্ডের সঙ্গীত গবেষক আর্নল্ড বাকে-এর তোলা কেন্দুলির ছবিটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা এই মেলা থেকে হয়তো কেন্দুলিতে যাব, তারপর আর কোথাও। কেমন ছিল কেন্দুলি আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর আগে? কেমন ছিল বাউলগান? গানের শ্রোতারা কেমন ছিলেন, কারা শ্রোতা হতেন এইসব মেলায় তখন? এমনই কিছু প্রশ্ন জেগে ওঠে এই ছবিগুলি দেখলে।

সব শেষে বলি, এই লেখাটা আমি লিখলেও, লিখছি আসলে বাউল ফকির উৎসব কমিটির সকলের হয়ে। অনেকের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার আছে। সিলেটের সুমন বিস্তর সহযোগিতা করেছেন, প্রদীপ পাল হাজার কাজের মধ্যে আমাদের জন্য লেখা, ছবি করে পাঠিয়েছেন, শবনম ভিরমানিও তাই — লেখা ছবি, যেমন চেয়েছি, তেমনি এক কথায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। কবীর চট্টোপাধ্যায় ভারি ভালো ছেলে — সে কত কষ্ট করে অল্প সময়ের মধ্যে শবনমের লেখাটা অনুবাদ করে দিয়েছে। সুদীপ্ত হাজারো ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে লেখা পরিমার্জন করা থেকে প্রুফ দেখা পর্যন্ত করে দিয়েছে, ঈপ্সিতা ওর আনকোরা গবেষণার বিষয়ে একবার বলতেই লিখে দিয়েছে, উত্তর চব্বিশ পরগণা, অশোকনগরের প্রশান্তদা রাধাশ্যাম দাসের বিষয়ে লিখে আমাদের বাধিত করেছেন।

আমরা অনেকে মিলে দেড় মাস ধরে এই পত্রিকার কাজ করছি। সাত্যকি, স্রোতা, সুকান্ত, পার্থদা, সৌম্যদা, সবাই আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। সাধু, অমিত, বিকাশ — যারা প্রেসের দিকটা সামলেছে — ওরা তো আছেই। তবু আমি অনেক ভুলই শুধরোতে পারলাম না। তার দায় একান্তই আমার।

মৌসুমী ভৌমিক
বাউল ফকির উৎসব কমিটি
কলকাতা, ২০১৩

লালন : মানবজমিন আবাদের মরমি কৃষক

আবুল আহসান চৌধুরী

বাউলের গান যে বাঙালির অন্তর্জগতে ঠাঁই করে নিয়েছে, তার মূলে রয়েছে লালন সাঁই ফকিরের (১৭৭৪-১৮৯০) অবদান। একটি অন্তর্মুখী মরমি সম্প্রদায়ের নিছক সাধন-সংগীত তাঁর স্পর্শে পেয়েছে সংগীত-সাহিত্যের মর্যাদা। আজ প্রায় দুই শতাব্দী লালনের গান একদিকে যেমন বাঙালির মরমি-মানসের অধ্যাত্মক্ষুধা, অপরদিকে তেমনি রসতৃষ্ণা মিটিয়ে আসছে।

২

কিন্তু এই আত্মনিমগ্ন সংসার-নির্লিপ্ত সাধকের জীবন-কাহিনী রহস্যে ঘেরা। তাঁর জন্ম ও ধর্ম নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। লালন নিজেও তাঁর আত্মপরিচয় সম্পর্কে নীরব ও নিস্পৃহ ছিলেন। তাঁর জীবনের প্রামাণ্য উপকরণও আজ মেলা ভার। এর ফলে সেই ফাঁক পূরণ করেছে জনশ্রুতি ও অনুমান।

পলাশির যুদ্ধের ১৭ বছর পর বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় সন্ধিক্ষণে লালনের জন্ম। অনেকেরই ধারণা, লালন ফকির জন্মসূত্রে হিন্দু কায়স্থ পরিবারের সন্তান এবং তাঁর জন্ম সেকালের নদীয়ার অন্তর্গত বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার অধীন কুমারখালী থানার ভাঁড়ারা গ্রামে। মাধব কর ও পদ্মাবতী তাঁর জনক-জননী। তীর্থভ্রমণ বা গঙ্গাস্নানে গিয়ে উৎকট বসন্তরোগে আক্রান্ত জ্ঞানহীন লালনকে মৃত বিবেচনায় তাঁর সঙ্গীরা নদীতে ভাসিয়ে দেয় বা অন্তর্জলি করে। পরে এক মুসলমান তাঁতি তাঁকে উদ্ধার করেন এবং তাঁরই আশ্রয়ে যত্নে ও সেবায় লালনের আরোগ্য হয়। এরপর লালন ঘরে ফিরলে 'যবন-সঙ্গদোষে'র কারণে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হন। ফলে সমাজ সংসার-প্রত্যাখ্যাত লালনকে ঘর ছাড়তে হয়। পরে একসময় বাউলের দলে ভেড়েন এবং বাউলগুরু সিরাজ সাঁইয়ের কাছে দীক্ষা নেন। এরপর ছেঁউড়িয়ায় এসে আখড়া

স্থাপন করেন এবং কালক্রমে তাঁকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে ওঠে 'লালনমণ্ডলী' — 'সাধুর সাধবাজার'। লালনের নাম ছড়িয়ে পড়ে সারা বঙ্গদেশে। 'হিতকরী' (৩১ অক্টোবর ১৮৯০) পত্রিকা জানাচ্ছে, ''লালন ফকীরের নাম এ অঞ্চলে কাহারও শুনিতে বাকী নাই। শুধু এ অঞ্চলে কেন, পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে রঙ্গপুর, দক্ষিণে যশোহর এবং পশ্চিমে অনেক দূর পর্যন্ত বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক লোক এই লালন ফকীরের শিষ্য; শুনিতে পাই তাঁহার শিষ্য দশ হাজারের উপর। লালন তাঁর সাধনপীঠ ছেঁউড়িয়াতেই ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর (১ কার্তিক ১২৯৭) দেহত্যাগ করেন। দীর্ঘজীবী লালন ১১৬ বছরের আয়ু পেয়েছিলেন।

এর বাইরে লালনজীবনী সম্পর্কে অপর মত হল, লালন মুসলমান-সন্ততি, তাঁর জন্ম বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু থানার হরিশপুর গ্রামে। তবে এই মতের সমর্থনে কোনো তথ্যপ্রমাণ বা যুক্তি নেই বলে তা ব্যাপক প্রচারণা সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য হয়নি।

৩

লালন সাঁই বাউলসাধনার সিদ্ধ পুরুষ। তাঁর সাধনার ভেতর দিয়েই বাউলমতের সর্বোচ্চ বিকাশ। অতুলনীয় সংগীত-প্রতিভা ও তত্ত্বজ্ঞানের সমন্বয়ে লালন বাউলগানের একটি স্বতন্ত্র 'ঘরানা' নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর গানে বাউল-তত্ত্ব ও সাধনার গভীর পরিচয় মেলে। লালনের গানে দেহবিচার, মিথুনাত্মক যোগসাধনা, গুরুবাদ, মানুষতত্ত্ব — বাউলসাধনার এইসব বিষয় সঙ্গতভাবেই এসেছে। বাউলের সাধনার মূল অবলম্বন মানবদেহ ও মানবগুরুর নির্দেশনা। তাই দেহজরিপ ও গুরুবন্দনাই রয়েছে বাউলসাধনার মূলে। দেহকে কেন্দ্র করেই বাউলের সাধনা। এই দেহের মধ্যেই পরম পুরুষের বাস। তাই দেহবিচারের মাধ্যমে আত্মস্বরূপ নির্ণয় করতে পারলেই সেই পরম প্রত্যাশিত 'মনের মানুষে'র সন্ধান মেলে। লালনের গানে এই মানবদেহ কখনো 'ঘর', কখনো 'খাঁচা', আবার কখনো বা 'আরশিনগর' নামে অভিহিত হয়েছে। দেহঘরের বসতির পরিচয়-সন্ধানের ব্যাকুলতা তাঁর গানে প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে,

আমার এই ঘরখানায় কে বিরাজ করে।
তারে জনম-ভর একদিন দেখলাম নারে।।
নড়েচড়ে ঈশান কোণে

দেখতে পাইনে এ নয়নে
হাতের কাছে যার
ভবের হাট-বাজার
ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে।।

লালন বলেন, 'এই মানুষে আছে রে মন,/ যারে বলে মানুষরতন'। কিন্তু আফসোস্ এইখানে যে,

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে।
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব চক্ষেতে।।

মানবদেহই বাউলের পুণ্যতীর্থ। এই উপলব্ধি থেকেই লালনের ঘোষণা,

উপাসনা নাই গো তার
দেহের সাধন সর্ব-সার
তীর্থ-ব্রত যার জন্য
এ দেহে তার সকল মিলে।।

বাউলসাধনার সঙ্গে 'মিথুনাত্মক যোগসাধনা'র গভীর সম্পর্ক রয়েছে। 'চারিচন্দ্র'-ভেদ কিংবা 'মীন'-ধরা — এই রূপকের ভেতর দিয়ে সাধনার এই বিষয়টি বাউলগানে এসেছে। 'তিরপিনির তীরধারে, মীনরূপে সাঁই বিহার করে' — লালনের গানে এই গুপ্ত 'অধর মানুষ'কে ধরার প্রয়োজন ও কৌশল বর্ণিত হয়েছে —

সময় বুঝে বাঁধাল বাঁধলে না।
জল শুকাবে মীন পালাবে পস্তাবি রে মন-কানা।। ...
মাস-অন্তে মহাযোগ হয়
নীরস হতে রস ভেসে যায়
করিয়ে সে যোগের নির্ণয়
মীনরূপে খেল্ দেখলে না।।

যৌন-সম্ভোগ নয়, যৌন-সংযম ও কাম-নিয়ন্ত্রণই বাউলের মোক্ষের যথার্থ পন্থা। 'কামলোভী মনে'র 'মদনরাজার গাঁটরি-টানা'ই যাতে সার না হয়, তাই লালন হদিশ দিচ্ছেন সঠিক পথের।

জেন্তে-মরা প্রেম-সাধন কি পারবি তোরা।
যে প্রেমে কিশোর-কিশোরী হয়েছে হারা।।

শোসায় শোষে না ছাড়ে বাণ
ঘোর তুফানে বায় তরী উজান
ও তার কাম-নদীতে চর পড়েছে
প্রেম-নদীতে জল পোরা।।

'কামের ঘরে কপাট' না মারলে সাধন-ভজনের সকল আয়োজনই তো বৃথা। লালন তাই কামলোভী ভণ্ড সাধকের কৃত্রিম ভজনাকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'প্রেম জানে না প্রেমের হাটের বুলবুলা', কেন না 'তাঁর মন মেতেছে মদনরসে, সদায় থাকে সেই আবেশে'।

বাউল গুরুবাদী লৌকিক ধর্ম। গুরুতত্ত্ব তাই এই ধর্মসাধনার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। গুরু-বিনা সাধন-ভজন বৃথা। 'হিতকারী' পত্রিকাসূত্রে জানা যায়, লালন 'বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন'। লালনের গানে বাউলসাধনার এই অনুষঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। লালন বলেছেন,

ভবে মানুষ-গুরু নিষ্ঠা যার
সর্ব-সাধন সিদ্ধ হয় তার।

বাউলসাধনায় গুরুই সার্বভৌম শক্তি। গুরুর মূল্য-মর্যাদা ও প্রয়োজন-গুরুত্বের কথা তাই লালনের গানে বারবার এসেছে —

গুরু-রূপের ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে।
ও তার কিসের আবার ভজন-সাধন লোক-জানিত ক'রে।।

তাই সেই গুরুর প্রতিই লালনের বিনীত নিবেদন,

আমার জন্ম-অন্ধ মন-নয়ন
গুরু তুমি নিত্য-সচেতন
চরণ দেখব আশায় কয় লালন
জ্ঞান-অঞ্জন দেও নয়নে।।

— গুরু-বন্দনার উজ্জ্বল নিদর্শন শিল্প-শোভিত এই পদটি।

বাউল বেদ ও ব্রাহ্মণ্য আচারবিরোধী ধর্ম। লালন সাধনঘরের বসতিদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'ভুলো না মন বৈদিক ভোলে', কেন না 'বেদ-বেদান্ত পড়বে যত বাড়বে তত লখ্‌ণা'। বেদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তাই,

বেদে কি তার মর্ম জানে!
যেরূপ সাঁইর লীলা-খেলা
আছে এই দেহ-ভুবনে।।

বেদের জ্ঞান সাধককে কখনো সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে না — বরঞ্চ এক ধরনের বিভ্রান্তিরই জন্ম দেয়। পরমতত্ত্বের রহস্যভেদাকাঙ্ক্ষী লালন তাই আফসোস্ করে বলেন,

কার বা আমি কে বা আর
আসল বস্তু ঠিক নাহি তার
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার
উদয় হয় না দিনমণি।।

বাউলসাধনার 'মানুষতত্ত্বে' 'আরশিনগরের পড়শি' যিনি তিনিই লালনের 'মনের মানুষ', তিনি 'অলখ সাঁই', 'সাঁই নিরঞ্জন'। এই 'মানুষে'র অন্বেষণেই বাউলের সাধনার দিন বয়ে যায়। 'মানুষতত্ত্ব ভজনের সার' — এই জ্ঞানকে অন্তরে ধারণ করেই লালন বলেন,

মানুষতত্ত্ব যার সত্য হয় মনে
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে।।

মনের মানুষের সন্ধান, সাহচর্য ও মিলনের জন্যে লালনের মন সর্বদাই আকুল ও উৎকণ্ঠিত,

আমার মনের মানুষের সনে
মিলন হবে কতদিনে।।

কিন্তু সাধন-সিদ্ধি হয় না বলে,

সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে।।

বাউলের কোনো শাস্ত্র-গ্রন্থ নেই। গানেই এই সম্প্রদায়ের সাধন-ভজন ও আচার-দর্শনের পরিচয়। নিজের সাধনা, চর্চা, অনুশীলন ও উপলব্ধির ভেতর দিয়ে বাউলসাধনাকে বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন লালন। সাধক লালনের মর্ম-পরিচয় তাই তাঁর গানেই মিশে আছে। সেই হিসেবে, লালন সাঁই-ই বাউলমত ও সাধনার শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার এবং তিনিই ছিলেন এই মরমি-সাধনার প্রাণপুরুষ।

৪

বাউলগান বাংলার একটি প্রধান লৌকিক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাধনসংগীত। তাঁদের অধ্যাত্মসাধনার গূঢ়-গুহ্য পদ্ধতি কেবল দীক্ষিতজনের কাছে প্রচারের জন্যেই এই গানের জন্ম। শিল্প-সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস এখানে অনুপস্থিত। লালনও তাই বিশুদ্ধ শিল্প-প্রেরণায় তাঁর গান রচনা করেননি, বিশেষ উদ্দেশ্য-সংলগ্ন হয়েই তাঁর এই গানের জন্ম। তবে প্রায় ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনকে অতিক্রম করে লালনের গান অনায়াসে শিল্পের সাজানো বাগানে প্রবেশ করেছে স্বমহিমায়। লালনের গান তাই একই সঙ্গে সাধনসংগীত, দর্শনকথা ও শিল্পশোভিত কাব্যবাণী। তত্ত্বসাহিত্যের ধারায় চর্যাগীতিকা বা বৈষ্ণব পদাবলি সাধনসংগীত হয়েও যেমন উচ্চাঙ্গের শিল্প-সাহিত্যের নিদর্শন, তেমনি বাউলগানের শ্রেষ্ঠ নজির লালনের গান সম্পর্কেও এই একই কথা বলা চলে।

দীর্ঘজীবী লালন প্রায় পৌনে এক শতাব্দী ধরে গান রচনা করেছেন। তাঁর গানের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও অনুমান করা যায় তা অনায়াসেই হাজারের কোঠা ছাড়িয়ে যাবে। লালন ছিলেন নিরক্ষর, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের কোনো সুযোগই তাঁর হয়নি। কিন্তু তাঁর সংগীতের বাণীর সৌকর্য, সুরের বিস্তার, ভাবের গভীরতা আর শিল্পের নৈপুণ্য লক্ষ করে তাঁকে নিরক্ষর সাধক বলে মানতে দ্বিধা থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে লালন ছিলেন স্ব-শিক্ষিত। ভাবের সীমাবদ্ধতা, বিষয়ের পৌনঃপুনিকতা, উপমারূপ-চিত্রকল্পের বৈচিত্র্যহীনতা ও সুরের গতানুগতিকতা থেকে লালন ফকির বাউলগানকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর সমকালেই তাঁর গান লৌকিক ভক্তমণ্ডলীর গণ্ডি পেরিয়ে শিক্ষিত সুধীজনকেও গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। উত্তরকালে লালনের গান দেশের ভূগোল ছাড়িয়ে পরদেশেও স্থান করে নিয়েছে। লোকপ্রিয় লালনের গান আজ সংগীত-সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে।

এই নিরক্ষর গ্রাম্য সাধককবির শিল্প-ভুবনে প্রবেশ করলে বিস্মিত হতে হয় যে, তিনি কতো নিপুণভাবে শিল্পের প্রসাধন-প্রয়োগে রমণীয় করে তুলেছেন তাঁর গানকে। ভাব-ভাষা, ছন্দ-অলঙ্কার বিচারে এই গান উচ্চাঙ্গের শিল্প-নিদর্শন এবং তা তর্কাতীতরূপে কাব্যগীতিতে উত্তীর্ণ।

সুরের সহযোগে শব্দের জিয়ন-কাঠিই কবিতা কিংবা সংগীত-পদের শরীরে প্রাণ-প্রবাহ সঞ্চার করে থাকে। কুশলী হাতে প্রচলিত শব্দ নতুন ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য নিয়ে ধরা দেয়। প্রয়োগ-নৈপুণ্যে আটপৌরে শব্দও যে কীভাবে নতুন অর্থ-

ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে লালনের গান তার উজ্জ্বল উদাহরণ। লালন ছিলেন সচেতন শব্দ-কুশলী শিল্পী। 'বাড়ির কাছে আরশিনগর সেথা এক পড়শি বসত করে' লালনের এক প্রাতিস্বিক গান। এখানে পরম আকাঙ্ক্ষিত অচিন এক পড়শির সঙ্গে মিলনের ব্যাকুলতা প্রকাশিত। সেই অধরা মানুষের পরশ লাভ করলে লালনের ভব-বন্ধন-জ্বালা যেত ঘুচে। কিন্তু 'সে আর লালন একখানে রয়,/ তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে'। এখানে 'যোজন' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। দূরত্ব-নির্দেশক 'যোজন' শব্দটি এখানে যেভাবে সুপ্রযুক্ত, দূরত্বজ্ঞাপক আর কোনো শব্দই এর যোগ্য বিকল্প হতে পারে না। 'যোজন'-এর পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ এখানে ব্যবহৃত হলে শুধু এই পঙ্‌ক্তিটিই নয়, সম্পূর্ণ গানটিরই শিল্প-আঁটুনি শিথিল হয়ে যেত।

শব্দের শুদ্ধরূপের বিচ্যুতি বা তার আঞ্চলিক রূপের প্রয়োগও যে লালনের গানে কতো সুন্দর মানিয়ে যায় তার দৃষ্টান্ত অপ্রচুর। যেমন, গাহেক (গ্রাহেক) — 'খুলবে কেন সে ধন ও তার গাহেক বিনে' কিংবা 'গেরাম' (গ্রাম) — 'গেরাম বেড়ে অগাধ পানি'।

লালন তাঁর গানে সমার্থক শব্দের ('আরশি', 'আয়না', দর্পণ') ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারে বিশেষ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন, যেমন — ক. 'বাড়ির কাছে আরশিনগর', খ. 'আয়নামহল তায়', গ. 'জানো না মন পারাহীন দর্পণ'।

'নিরক্ষর' লালনের তৎসম শব্দের অজস্র ও উপযুক্ত ব্যবহার বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বাংলা শব্দের সঙ্গে আরবি-ফারসি শব্দের গভীর আত্মীয়তা-যোগ ঘটিয়ে তিনি তাঁর গানকে আরো আকর্ষণীয় ও শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছেন। ক্বচিৎ ইংরেজি শব্দের প্রয়োগও তাঁর গানে দুর্লক্ষ্য নয়। এর থেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে গ্রাম্যসাধক লালনের শব্দ-চেতনা কত পরিশীলিত এবং তাঁর শব্দ-ভাণ্ডার কত সমৃদ্ধ ছিল।

লালনের অসাধারণ ছন্দ-জ্ঞান প্রাজ্ঞ ছান্দসিকের মনেও বিস্ময় জাগায়। লালনের গানের ছন্দ-বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা পেয়েছিল। তিনি লালনের 'আছে যার মনের মানুষ মনে' এবং 'এমন মানবজনম আর কি হবে' — এই গান দুটি উদ্ধৃত করেন, "এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেয়ে নয়। ছোটো-বড়ো নানাভাগে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধুপ্রসাধনে মেজে-ঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো' ('ছন্দ', বিশ্বভারতী, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৬২; পৃ. ১৩০)। ছন্দের শাসন যে লালনের গানকে একটি নিটোল

শিল্পে পরিণত করেছে, রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে তার সমর্থনে পাওয়া যায়। তাঁর ছন্দবোধ অনুশীলনের ফসল নয়, বরঞ্চ তা তাঁর স্বভাবেরই অন্তর্গত শিল্প-ধারণা থেকে সৃষ্ট।

অলঙ্কার-প্রয়োগে লালনের নৈপুণ্যও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। লাগসই উপমা-রূপক-চিত্রকল্প-উৎপ্রেক্ষা লালন-গীতিকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। উপমা ও চিত্রকল্পের যুগল ব্যবহার লালনের গান হয়ে উঠেছে দীপ্তিময়।

মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন
লুকালে না পায় অন্বেষণ
কালারে হারালেম তেমন
ও রূপ হেরিয়ে স্বপনে।।

কিংবা আরেকটি উদাহরণ,

এক নিরিখে দেখ ধনি, সূর্যগত কমলিনী
দিনে বিকশিত কমলিনী, নিশিথে মুদিত রহে।
তেমনি জেন ভক্ত যে জন, একরূপে বাঁধে হিয়ে।।

রূপকের আড়ালে রয়েছে বাউলগানের নিগূঢ় মর্মার্থ। বাউলগানের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে তাই লালনের গানেও অনিবার্যভাবেই রূপক এসেছে। যেমন নীচের এই গানটি,

লাগল ধুম প্রেমের থানাতে
মন-চোরা পড়েছে ধরা রসিকের হাতে।
ও সে ধরেছে চোরকে হাওয়ায় ফাঁদ পেতে।।

ভক্তি-জমাদারের হাতে
দু'দিন চোর জিম্মা থাকে
তিনদিনের দিন দেয় সে চালান
আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে।।

প্রচলিত ইঙ্গিতধর্মী প্রবাদ-প্রবচন-সুভাষণের ব্যবহার তাঁর কাব্যগীতিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তাঁর বক্তব্যের যৌক্তিক ভিত্তি-অর্জনের জন্যে এই প্রয়োগ বিশেষ সহায়ক হয়েছে। লালনগীতিতে সংযোজিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবাদ-প্রবচন-সুভাষণ —

ক. কাক মারিতে কামান-পাতা
খ. পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর
গ. হাওয়ার চিড়ে, কথার দধি, ফলার হচ্ছে নিরবধি
ঘ. হাতের কাছে হয় না খবর, কি দেখতে যাও দিল্লি-লাহোর

অনুপ্রাসের ব্যবহার লালনের গানকে বিশেষ ধ্বনি-ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করেছে। যেমন —

ক. গুরু তুমি তন্ত্রের মন্ত্রী
গুরু তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী
গুরু তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী
না বাজাও বাজবে কেনে।।
খ. যার যেখানে ব্যথা নেহাত, সেইখানে হাত ডলামলা।
গ. ধর রে অধরচাঁদেরে অধরে অধর দিয়ে।
ঘ. কারুণ্য তারুণ্য এসে লাবণ্যে যখন মিশে।
ঙ. আঁখির কোণে পাখির বাসা।

লালনের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় তাঁর অনেক গানেই পাওয়া যায়। বহুল উচ্চারিত তত্ত্বকথা ও সীমাবদ্ধ বিষয়ের অনুবর্তন সত্ত্বেও লালন তাঁর সংগীতে সেই গতানুগতিক ধারাকে অতিক্রম করে নতুন ভাবব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন। তত্ত্বকথার দুরূহ ও ক্লান্তিকর বদ্ধ আবহে এনেছেন শিল্প-সৌন্দর্যের সুবাতাস। তাই বাংলার মরমি কবিদের মধ্যেই যে কেবল তিনি শ্রেষ্ঠ তাই নয়, বাংলার সংগীতসাহিত্যের ইতিহাসেও তিনি এক কালোত্তীর্ণ স্মরণীয় শিল্পী-ব্যক্তিত্ব।

মূলত লালনের গানের অসামান্য শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য, উচ্চাঙ্গের দর্শন ও প্রবল মানবিকতাবোধের জন্যে এদেশে রবীন্দ্রনাথ থেকে অন্নদাশঙ্কর রায় এবং বিদেশে চার্লস ক্যাপওয়েল থেকে ক্যারল সলোমন — এঁরা লালনের গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। বাউলগানের রসজ্ঞ বোদ্ধা রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক কবিতায় বলেছিলেন,

সাহিত্যের ঐকতানসঙ্গীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যে পায় —
("ঐকতান", 'জন্মদিনে')

— তাঁর এই আন্তরিক প্রত্যাশা বাংলা সাহিত্যের দরবারে লালন ফকিরের

স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্থকভাবে পূরণ হয়েছে সার্বিক বিচারে হয়তো এ-কথা বললে ভুল হয় না।

৫

বাউলগান লৌকিক সমাজের অধ্যাত্মসাধনার অবলম্বন হলেও লালনের হাতে তা অধিকতর সামাজিক তাৎপর্য ও মানবিক বিশ্বাসে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। লালনের গানে ধর্মসমন্বয়, সম্প্রদায়-সম্প্রীতি, মানব মহিমাবোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, আচারসর্বস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধতা, বর্ণশোষণ-জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গের প্রতি ঘৃণা, সামাজিক অবিচার ও অসাম্যের অবসান-কামনা — এইসব বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। মূলত তাঁর বিদ্রোহ প্রথার আনুগত্য, হৃদয়হীন শাস্ত্রাচার ও প্রচলিত সমাজধর্মের বিরুদ্ধে। এইসব বক্তব্যের ভেতর দিয়ে তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবতাবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। আন্তরিক বোধ ও বিশ্বাসকে অকপটে লালন তাঁর গানে প্রকাশ করেছেন। তাঁর আদর্শ ও জীবনাচরণের সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের কোনো অমিল হয়নি — বিরোধ বাধেনি কখনো।

লালনের গান মানব-বন্দনা ও মানব-মহিমারও গান। ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনকে সুকর্মে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়ে লালন বলেছেন,

অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই
দেব-দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে এই মানবে।।

কত ভাগ্যের ফলে না জানি
মন রে পেয়েছো এই মানবতরণী
বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায়
যেন ভারা না ডোবে।।

সাধন-ভজনের পথ-নির্দেশের জন্যে দেব-দেউল কিংবা কোনো প্রত্যাদেশ নয়, মর্ত্যের মানবগুরুকেই লালন ধ্রুবতারা মেনেছেন। দুর্লভ মানবজনমের গুরুত্ব, মানবমুখীন চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ এইভাবে লালনের গানে জয়ী হয়েছে। এদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গের অস্তিত্ব ছিল

দুষ্টক্ষতের মতোই। এই কুপ্রথা ও কুসংস্কার ধর্মকে আশ্রয় করে সমাজজীবনোক্ত আসন প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। মানুষের মনে এই সংস্কার ও ভেদবুদ্ধি এমন গভীর ছাপ ফেলেছে যে সহজে ও সমূলে এর উচ্ছেদ সম্ভব হয়নি। লালন এই অপশক্তির বিরুদ্ধেই আজীবন লড়াই করেছেন। লালন জানতেন, শুদ্ধ সাধনভক্তির জোরে অবজ্ঞান তন্তুবায় কবির ও অস্পৃশ্য চর্মকার রামদাস মহাসাধকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাই তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে,

ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে তার জাতের বিচার নাই।।

লালন জীবনভর জাতিভেদ, ছুঁৎমার্গ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করে এসেছেন। তাঁর নিজের জীবনেও এই ধরনের দুঃখজনক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে অনেকবারই। প্রথম জীবনে মুসলমানের গৃহে অন্ন-জল-আশ্রয় গ্রহণের জন্য লালনকে শুধু সমাজচ্যুতই হয়ে হয়নি, স্নেহময়ী জননী ও প্রিয়তমা পত্নীকেও হারাতে হয়েছে। এইসব নির্মম ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার কারণেই হয়তো তাঁর ভেতরে গড়ে উঠেছিল একটি প্রতিবাদী সত্তা। লালন তাই কখনোই জাতিত্বের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চাননি। একজন মানবপ্রেমী সংস্কারমুক্ত বাউল হিসেবে তিনি জানতেন, জাতের সীমাবদ্ধতা মানুষকে খণ্ডিত ও কূপমণ্ডুক করে রাখে। তাই জাতধর্মের বিরুদ্ধে চরম বক্তব্য পেশ করে তিনি বলেছেন,

জাত না গেলে পাইনে হরি
কি ছার জাতের গৌরব করি
ছুঁসনে বলিয়ে।
লালন কয় জাত হাতে পেলে
পুড়াতাম আগুন দিয়ে।।

লালন মধ্যযুগের সন্তসাধক কবির-তুলসিদাস-দাদু-পল্টু-রজ্জবের মতোই ধর্মীয় বিভেদকে তুচ্ছ করে সম্প্রদায়-সম্প্রীতির স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানের জাতিগত বিরোধ ও বৈষম্যের বিপক্ষে আন্তরিক ও জোরালো সওয়াল করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর গানে অনবদ্য ও অকাট্য যুক্তি-সন্নিবেশের মাধ্যমে বিভেদকামী মানসিকতাকে ধিক্কার দিয়েছেন তীব্রভাবে,

একই ঘাটে আসা-যাওয়া
একই পাটনি দিচ্ছে খেওয়া
কেউ খায় না কারো ছোঁয়া
বিভিন্ন জল কে কোথায় পান।।

পাশাপাশি আবার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন,

বেদ-পুরাণ করেছে জারি
যবনের সাঁই আর হিন্দুর হরি
আমি তা বুঝতে নারি
দুইরূপ সৃষ্টি করলেন কি তার প্রমাণ।

আবার পাশাপাশি নিজেই সিদ্ধান্তে এসেছেন এই মরমি সাধক,

এক চাঁদে হয় জগৎ আলো
এক বীজে সব জন্ম হলো
ফকির লালন কয় মিছে কল'
কেন করিস সদাই।।

• লালনের এই বক্তব্যে ভেদহীন অখণ্ড মানবসমাজের ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

লালনের আচার-আচরণ ও বক্তব্যে সমকালের মানুষ ধাঁধায় পড়েছিল তাঁর জাত-পরিচয় নিয়ে। লালন বহুবার জাত-ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক জাতিত্বে অবিশ্বাসী লালন এই প্রশ্নের সরাসরি কোনো জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেছেন। তাঁর সেই বক্তব্যের যুক্তিতে জাতবিচারী মানুষের অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে। লালন স্পষ্টই বলেছেন, তিনি হিন্দু না মুসলমান এ প্রশ্ন তার কাছে অর্থহীন ও অসমাধ্য। এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আর বিশ্বাসের আগুনে পোড়া নিখাদ বক্তব্য,

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন কয় জেতের কি রূপ দেখলাম না নজরে।।

মানুষের জাতি-গৌরব-চেতনাকে প্রশ্রয় দেননি লালন, তাই সে 'জেতের ফাতা' বিকাতে চেয়েছেন 'সাধ-বাজারে'।

লালনের গান বাউল সম্প্রদায়ের গুহ্য-সাধনার বাহন হলেও এর ভেতরে মাঝে-মধ্যে বিস্ময়কর সমাজচেতনা প্রকাশিত হয়েছে। সামাজিক অবিচার ও

অসাম্য, ধর্মীয় গোঁড়ামি, শ্রেণী-শোষণ ও গোত্র-বৈষম্য এই মরমি সাধকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাই অধ্যাত্ম-উপলব্ধির অবসরে, প্রক্ষিপ্ত চিন্তার চিহ্ন হলেও, তিনি এসব বিষয়ে তাঁর অকপট-আন্তরিক বক্তব্য পেশ করেছেন। বিত্তবান ও বিত্তহীন, কুলীন ও প্রকৃত, শোষক ও শোষিতে বিভক্ত সমাজে দরিদ্র-নিঃস্ব-নির্যাতিত নিম্নবর্গের মানুষের প্রতিনিধি ছিলেন লালন।

লালনের সাহসী সামাজিক ভূমিকায় একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে তার পরমবান্ধব কাঙাল হরিনাথকে জমিদারের সহিংস আক্রোশ থেকে রক্ষার ঘটনায়। হরিনাথ তাঁর 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় শিলাইদহের ঠাকুর-জমিদারদের প্রজা-পীড়নের সংবাদ প্রকাশ করলে জমিদারপক্ষ তাঁর ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। কাঙালকে শায়েস্তা করার জন্য তাঁরা দেশীয় লাঠিয়াল ও পাঞ্জাবি গুন্ডা নিয়োগ করেন। কাঙালের অপ্রকাশিত 'দিনপঞ্জি' থেকে জানা যায়, জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর হাত থেকে বিপন্ন বন্ধু হরিনাথকে রক্ষার জন্যে বাউলসাধক লালন ফকির 'তার দলবল নিয়ে নিজে লাঠি হাতে সেই লাঠিয়ালের দলকে আচ্ছা করে ঢিট্ করে সুহৃদ কৃষকবন্ধু হরিনাথকে রক্ষা করেন' (হেমাঙ্গ বিশ্বাস, 'লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫, পৃ. ৬৭-৬৮)। লালন তাঁর উদার ও প্রগতিশীল মানসতার কারণে সমকালীন সমাজে যথেষ্টই নিন্দিত ও নিগৃহীত হয়েছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শাস্ত্রবাহক মৌলবাদীরাই লালনের বিপক্ষে ছিলেন।

উত্তরকালেও লালনবিরোধী আন্দোলন একেবারে থেমে যায়নি। জারি হয়েছে বাউলধ্বংস ফতোয়া। মুসলমানদের চোখে লালন বেশরা-বেদাতি নাড়ার ফকির; আবার হিন্দুর নিকটে ব্রাত্য-কদাচারী হিসেবে চিহ্নিত। ধর্মগুরু ও সমাজপতি উভয়েরই কাছেই লালনের বাণী ও শিক্ষা অস্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু লালন তাঁর ধর্মবাণীকে সমাজশিক্ষার বাহন করে ক্রমশ তাঁর আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে যাত্রা অব্যাহত রেখেছিলেন।

লালনের গান সমাজ-সম্পর্কের ধারা বেয়ে সাম্প্রদায়িকতা-জাতিভেদ-ছুঁৎমার্গ — এইসব যুগ-সমস্যাকে চিহ্নিত করে তার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছিল। এই প্রয়াসের মাধ্যমে লালন সমাজসচেতন, মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিচয় দিয়েছেন তার স্বরূপ নির্ণয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। লালনের এই ঐতিহাসিক ভূমিকাকে কেউ কেউ বাংলার সামাজিক জাগরণের পুরোধা রাজা রামমোহন রায়ের অবদানের সঙ্গে তুলনা করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর

রায় মন্তব্য করেছেন, ''বাংলার নবজাগরণে রামমোহনের যে গুরুত্ব বাংলার লোক-মানুষের দেয়ালী উৎসবে লালনেরও সেই গুরুত্ব'' ('লালন ও তার গান', কলকাতা, ১৩৮৫, পৃ. ২৪)। অধ্যাপক অমলেন্দু দে-ও লোকায়ত জীবনে লালনের সুগভীর প্রভাব এবং নবজাগৃতির প্রেক্ষাপটে লালন ও রামমোহনের ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন ('বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ', কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ৪-৫)। আমাদের বিশ্বাস, নবজাগৃতির পটভূমিকায় রামমোহন ও লালনের তুলনামূলক আলোচনা হলে দেখা যাবে লালনের অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবতাবাদ, সংস্কার ও জাতিভেদ-বিরুদ্ধ মনোভাবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি। জানা যাবে, লালনের মানবিক মূল্যবোধ ও মানবধর্মী চিন্তাধারার প্রভাব বাংলার গ্রামদেশের প্রাকৃত জনগোষ্ঠী এবং নগরবাসী কিছু শিক্ষিত কৃতী পুরুষের মনেও কী গভীর প্রভাব ফেলেছিল, কতখানি আন্তরিক ও অকৃত্রিম ছিল সেই প্রচেষ্টা। নবজাগৃতির অন্যতম শর্ত যে অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদ তা এই অশিক্ষিত গ্রাম্যসাধকের বাণী ও সাধনার ভেতরেই প্রকৃত অর্থে সত্য হয়ে উঠেছিল — প্রাণ পেয়েছিল। যথার্থই গ্রাম-বাংলার এই মানবতাবাদী মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন লালন সাঁই।

৬

লালন-আবিষ্কারের কৃতিত্ব মূলত রবীন্দ্রনাথের। যদিও তাঁর আগে কেউ কেউ লালনের গান ও জীবনী প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যথার্থ অর্থে রবীন্দ্রনাথের সৌজন্যেই বাঙালি সমাজে লালন সম্পর্কে কৌতূহল ও আগ্রহ জাগে। তাই এই মরমি সাধকের পরিচয়ের পরিধি প্রসারে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম লালনের গানের উল্লেখ করলেন ভাদ্র ১৩১৪-তে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে। 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়' — এই একই গানের প্রথম দু'টি পঙ্‌ক্তির উল্লেখ মেলে 'জীবনস্মৃতি' (১৩১৯) গ্রন্থের 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়ে। এরপর ১৩৩২ সালে 'ভারতীয় দর্শন সংঘে'র সভাপতির ভাষণেও এই 'অচিন পাখি'র গানের উল্লেখ করে এর সঙ্গে তুলনা করেন ইংরেজ-কবি শেলীর একটি কবিতার। জমিদারি কাজে 'পদ্মা-প্রবাহ-চুম্বিত' শিলাইদহে বাসের সময়ে রবীন্দ্রনাথ ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে লালনের গানের দু'টি খাতা সংগ্রহ করেন, যাতে সব মিলিয়ে ২৯৮টি গান ছিল। ১৩২২ সালের আশ্বিন থেকে মাঘ পর্যন্ত

চার কিস্তিতে 'প্রবাসী' পত্রিকার 'হারামণি' বিভাগে রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের মোট কুড়িটি গান প্রকাশিত হয়। এরপর ১৩৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠিত 'ছন্দের প্রকৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে, যা পরে 'ছন্দ'-গ্রন্থে সংযোজিত হয়, রবীন্দ্রনাথ লালনের তিনটি গান উদ্ধৃত করে এর ছন্দ-সুষমার প্রশংসা করেন। এ-ছাড়া 'Religion of Man', 'An Indian Folk-Religion' কিংবা 'মানুষের ধর্ম'-বিষয়ক বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ যে মরমি দার্শনিক তত্ত্বের আলাচনা করেছেন, তাঁর মূলেও ছিল লালনীয় তত্ত্ব-দর্শনের প্রচ্ছন্ন প্রভাব।

লালনের সংগীত ও দর্শন রবীন্দ্রমানসে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর 'রবীন্দ্রবাউল'-এ রূপান্তরিত হওয়ার পেছনেও ছিল লালনের প্রভাব। লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়' গানটি রবীন্দ্রনাথের ভাবজগতে পরিচালিকা-শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। 'কে কথা কয় রে, দেখা দেয় না' — লালনের এই গানের ভাগ-সত্যকে তিনি তাঁর 'রাজা' নাটকে রূপায়িত করেছেন। বাউলগান, বিশেষ করে লালনের গান রবীন্দ্রমননে যেমন তাঁর গানেও তেমনি স্পষ্টছাপ ফেলেছে — প্রেরণা হয়েছে অনেক কবিতার। অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গের গানে লালনগীতির কথা ও সুরের প্রভাব ও সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ার কষ্টকর নয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শক্তিমান, সচেতন, অসামান্য এক শিল্পী-পুরুষ। তাই তিনি লালনের বাণী ও সুরকে ভেঙে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন, যা একান্তই 'রবীন্দ্রবাউল'-এর রচনা। তবে একথা বলতেই হয়, রবীন্দ্রনাথের মরমি-মানসে লালন ছিলেন প্রেরণার এক স্বতঃস্ফূর্ত উৎস।

৭

লালনের পরিচয় ও প্রতিষ্ঠার পরিধি আজ দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে বিশ্বের মানচিত্রকে স্পর্শ করেছে। ইউনেস্কো ২৫ নভেম্বর ২০০৫-এ বাংলাদেশের বাউলগানকে 'a Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বলাই বাহুল্য এর মূলে রয়েছে লালনের গান। সঙ্গত কারণেই তাঁর প্রতি বাইরের জগতের মনোযোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদেশে বাউল ও লালন সম্পর্কে আগ্রহ ও অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় চার্লস ক্যাপওয়েল, এডওয়ার্ড সি. ডিমক, জোসেফ কুকার্জ, জুন ম্যাকড্যানিয়েল, ক্যারল সলোমন, মাসায়ুকি ওনিশি, জান ওপেন শ', মাসাহিকি তোগাওয়া প্রমুখের

রচনায়। অদূর ভবিষ্যতে বহির্বিশ্বে লালন বাংলাদেশে ও বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রতিনিধি-ব্যক্তিত্ব হিসেবে গৃহীত হবেন সে সম্ভাবনা ক্রমশ স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

লালনের জন্মের পর ২৩৫ আর মৃত্যুর পর পেরিয়ে গেছে দীর্ঘ ১১৯ বছর। তবু আজও লালন সমান প্রাসঙ্গিক ও আধুনিক। তাঁর গান বাউল সমাজের সাধনার উপকরণ হিসেবে যেমন বিবেচিত, তেমনি সংগীত রসিকের মরমি চিত্তকেও আলোড়িত করতে সক্ষম, পাশাপাশি সমাজভাবনার অনুষঙ্গেও তা মূল্যবান। সম্প্রতি প্রয়াত লালন-গবেষক ডক্টর ক্যারল সলোমন একবার এক আলাপচারিতায় বলেছিলেন, 'লালন যে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী, সে মেসেজটা বেশ কয়েকটা গানে পাওয়া যায়। ... আবার বেশ কিছু গান আছে যা গোঁড়ামি এবং সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। লালন বিশ্বাস করেছিলেন যে, মানুষ শ্রেষ্ঠ। তা হলে দেখা যায় যে, লালনের গানে বিশ্বমানবমৈত্রীর উপকরণ আছে' ('মনের মানুষের সন্ধানে', আবুল আহসান চৌধুরী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১২৫)।

আজ সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদের উত্থানের কালে — মনুষ্যত্ব-মানবতার লাঞ্ছনার সময়ে — সন্ত্রাস-নৈরাজ্যের বৈরী যুগে লালনের গান হতে পারে প্রতিবাদের শিল্প-শান্তি ও শুভবুদ্ধির প্রেরণা — মানুষের প্রতি হারানো বিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনার পরম পাথেয়। আলেক সাঁই।

লালন জীবনীকার আবুল আহসান চৌধুরী কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক। তিনি আমাদের বাউল ফকির উৎসব কমিটির জার্নাল আরশিনগর-এর নিয়মিত লেখক।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা লালন ফকিরের প্রতিকৃতি (১৮৮৯),
সূত্র : www.lalon.org

হাওর। ছবি : সুকান্ত মজুমদার।
সূত্র : The Travelling Archive. www.thetravellingarchive.org

হাওরের লিলুয়া বাতাসে ভেসে আসা গান

সুমনকুমার দাশ

ভাটি অঞ্চল — যেখানে ছয় মাস পানি আর বাকি ছয় মাস শুকনো মৌসুম। বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া — এই সাতটি জেলার ৪০টি উপজেলা জুড়ে ভাটি অঞ্চল বিস্তৃত। পুরো অঞ্চলে সুতোর মতো জড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য হাওর-খাল-বিল-নদী-নালা। প্রকৃতি যেন তার অপার সৌন্দর্যে ও অঞ্চলকে অপরূপ করে সাজিয়ে রেখেছে। প্রকৃতির মতোই উদার ও প্রাণবন্ত এখানকার মানুষও। ভৌগলিক বৈচিত্রের কারণেই বোধহয় হাওরবেষ্টিত জনপদের জীবনাচরণ ও সংস্কৃতি অত্যন্ত বিচিত্র, বর্ণিল, সমৃদ্ধ ও প্রাণবান।

ভাটি অঞ্চলের আশি ভাগ মানুষের পেশা কৃষিকাজ কিংবা মৎস্যশিকার। সঙ্গত কারণেই দিনে হাড়ভাঙা পরিশ্রম এঁদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। কিন্তু সেই পরিশ্রমী মানুষদের কাছে দিনের সূর্য ডোবার মুহূর্তটুকু যেন নতুন আমেজে হাজির হয়। দিনমান কাজ শেষে বাড়ি ফিরে সেই মানুষেরা অনাবিল আনন্দে মেতে ওঠেন। গ্রামে গ্রামে বসে বিচিত্র সব গানের আসর, উৎসবের রং ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। যেহেতু আমিও ভাটি অঞ্চলেরই মানুষ, তাই এখানকার আচার-অনুষ্ঠানের অনেক কিছুর সঙ্গেই আমার জন্মগত এবং দৃঢ় একটি সম্পর্ক রয়েছে। ছোটোবেলা থেকেই নানা উৎসব-পার্বণকে উপলক্ষ করে মেতে ওঠা হাওরবাসীর নির্মোহ আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বড় হয়েছি। তাই আমি জানি, বর্ষায় হাওরের উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে বুক চিতিয়ে চলা ভাটির মানুষের কণ্ঠে গান অনেকটা আপনা-আপনিই ধ্বনিত হয়। শুকনো মৌসুমে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ ধানক্ষেতে ভোরের আলোয় স্নাত কৃষক মনের আনন্দে আপন খেয়ালে সুর ভাজেন। পুরো অঞ্চল জুড়ে যাত্রাগান, পালাগান, বাউলগান, কীর্তন, গাজীরগান,

ভাটিয়ালি, ধামাইলগান, মালসিগান, বারোমাসি, সূর্যব্রতের গান সহ কত ধরনের গানের যে প্রচলন রয়েছে।

হাওরের বিচিত্র সব গানের ধারার পাশাপাশি গ্রামীণ চিরায়ত সংস্কৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ নৌকাবাইচ, কুস্তি-খেইড়কে কেন্দ্র করেও অসংখ্য গান রচিত হয়েছে। এছাড়া মহরম উৎসব, দোলউৎসব, শ্যামাপূজাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে এখনও মূল আকর্ষণ গান। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীতে কৃষি উৎপাদনের সময় নানামুখী লোকাচারেও গানের ব্যবহার রয়েছে। হালচাষ, বীজ রোপণ, ফসল কাটা থেকে ঘরে তোলা পর্যন্ত নানা রকমের উৎসবের আয়োজন করা হয়, এতে আনুষঙ্গিক লোকাচার হিসেবে গান ও মন্ত্র পরিবেশিত হয়। গ্রামীণ লোকাচারের এই ধারাগুলো এখনও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ মেনে কৃষকেরা পালন করে থাকেন।

গানের জন্ম

বয়ঃজ্যেষ্ঠদের মুখে আমাদের না-দেখা অতীতের গল্প শুনি। কেমন করে একেকটা গান জন্ম নেয়, সেই গল্পও শুনি। ভাটির মানুষের জীবন বড় অদ্ভুত। বৈশাখের শেষ সময়ে কিংবা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরুতে পানি এসে ডুবিয়ে দেয় পুরো ভাটি অঞ্চল। আষাঢ় ও শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বর্ষণে মাঠ-ঘাট ভেসে যায়। বাড়ির উঠোন কাদায় থিকথিক করে। সেই বর্ষণ থেমে গেলে মানুষ মেতে ওঠেন নানান আনন্দ-আয়োজনে। জাতপাত, বৈষম্য আর ভেদাভেদ ভুলে সেই আনন্দযজ্ঞে গা ভাসান ভাটির সকল মানুষ। হেমন্তে যে-বছর ভালো ফসল হয়, সেই বছর খুব ঘটা করে উৎসব হয়। বাড়িতে বাড়িতে চলে বিয়ের আয়োজন। সে আয়োজনে নেচে-গেয়ে নারীরা মুখরিত করে তোলেন পুরো গ্রাম। ধামাইলগানের সুরের ঢেউ হাওরের লিলুয়া বাতাসে যেন আছড়ে পড়ে। প্রখ্যাত লোকগীতিকার রাধারমণ, প্রতাপরঞ্জন তালুকদারদের লেখা কত কত ধামাইলগান ফেরি করে বেড়ান গ্রামীণ নারীরা। এক গ্রামের নামকরা শিল্পীর ডাক পড়ে আরেক গ্রামে।

বছর দশেক আগে, এক বন্ধুর আমন্ত্রণে তার বোনের বিয়েতে নেত্রকোণা জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়েছিলাম। বন্ধুর কাকার বাসায় আমার ঘুমানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। বিয়ের আগের মধ্যরাত, মানে অধিবাসের সময়। ভাটি এলাকায় সেদিন রাতভর ধামাইলগান পরিবেশনার রীতির প্রচলন আছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়েতে ধামাইলগান নারীদের জন্য এক আনন্দের অনুষঙ্গ হিসেবে হাজির হয়।

মধ্যরাতে গান শুরু হওয়ার আগে আমি বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছিলাম। হঠাৎ ওপাশের ঘর থেকে শুনি চাপা কণ্ঠে ঝগড়ার আওয়াজ। বন্ধুর কাকা কী কারণে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বাক-বিতণ্ডা করছেন। ঠিক কিছুক্ষণ পর ধামাইলগান শুরু করার জন্য ঝগড়ারত ওই মহিলার ডাক পড়ে, 'আসছি' বলে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান। আমিও ধামাইলগান দেখার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে অনুষ্ঠানস্থলে যাই। প্রায় আধঘন্টা পর গান শুরু হয়। পনেরো-বিশজন নারী গোল হয়ে নেচে নেচে হাততালি দিয়ে ধামাইল পরিবেশনায় মেতে উঠেছেন, তারই মধ্যে বন্ধুর কাকীর কণ্ঠ শুনে চমক লাগে। এত সুরেলা কণ্ঠ যে মন জুড়িয়ে যায়। একটু আগে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ভুলে তিনি মজে গেছেন গানে। তাঁর চেহারা দেখে বেশ অনুমান করতে পারছিলাম যে তিনি গানের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছেন। এই মগ্নতার নেপথ্যে যে ভাটির লোকগানের সুরের জাদু কাজ করে, তা আমি ঐদিন উপলব্ধি করি। ভোররাতে গান শেষে কাকীর সঙ্গে আলাপ করি। 'এই গান কার কাছে শিখছইন?' তিনি হাসলেন। বললেন, 'গান কিতা কেউর কাছে শিখা লাগেনি? আমার মায় গাইতা, ঠাকুমায় গাইতা, আমি তাঁরার দেখাদেখি শিখছি। আমার মায় শিখছইন দিদিমার কাছ থেইকা। দিদিমা শিখছইন তান মার কাছ থেইকা। গ্রামের মাইয়ারা এইলাকানই গান শিখে।'

এই হল গান শেখার রহস্য। গ্রামের সামান্য শিক্ষিত মহিলারা একেকটা গান শিখে আর সেগুলো ভুল বানানে খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখা এসব গানের খাতা ওই নারীরা কোনোভাবেই হাতছাড়া করেন না, কারণ এই গান তাঁদের পরম সম্পদ। শুধু কি ধামাইলগান? একই কথা বলা যায় সূর্যব্রত'র গান, বারোমাসি থেকে শুরু করে বিভিন্ন মেয়েলি গান ও গ্রাম্যগীতের বিষয়েও। ভাটির নারীর বুকের ভেতরে যে অন্তহীন বেদনা ও দুঃখ, সেসবই যেন গানের পংক্তিতে-পংক্তিতে বিধৃত হয়েছে।

নারীদের মতো পুরুষরাও ভাটিতে মেতে ওঠেন যাত্রাগান, পালাগান, ঘাটুগান, কীর্তন, গোষ্ঠগান, কবিগান, টিক-লরানির গান, ত্রিনাথের গান আর বাউলগান নিয়ে। তাঁদের শিল্পীসত্তাও প্রকৃতিদত্ত। যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় তাঁরা গানের ধারা বহমান রেখেছেন। দিনে যে মাঝি খেয়ানৌকা চালায়, যে জেলে মাছ ধরে কিংবা যে কৃষক মাঠে ফসল ফলায়, রাতে সে-ই ডাকসাঁইটে কীর্তনীয়া, যাত্রাভিনয়শিল্পী অথবা দক্ষ পালাকার। এদের কারো কারো লোকবাদ্যের লহরিতে

মুখরিত হয় ভাটির পারিপার্শ্ব, কারো বা মনোমুগ্ধকর কণ্ঠের জাদুতে আচ্ছন্ন হয় ভাটিবাসী। গান এখানে আপন গতিতে ধাবমান। যে মানুষটি লেখাপড়া না জানায় টিপসই দিয়ে মহাজনের কাছ থেকে দাদন নিয়ে সর্বস্ব খোয়ায়, সেই ব্যক্তিটিই কিনা কেবল চোখের আন্দাজে পুঁথির ছাপা অক্ষরে আঙুল বুলিয়ে পড়ে ফেলতে পারে ৪৮০ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ বাইশকবির শ্রীশ্রী পদ্মপুরাণ। প্রতি শ্রাবণে মনসা দেবীকে উপলক্ষ করে প্রতি ঘরে পঠিত হয় পদ্মপুরাণ। এই সময়টাতে আকাশে-বাতাসে ভাসে নারী-পুরুষের সম্মিলিত সুর। ঘরে ঘরে কুপিবাতি জ্বালিয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত চলে পদ্মপুরাণের পুঁথিপাঠ।

মাত্র আটদিন নৈশ বিদ্যালয়ে পড়শোনা করা প্রয়াত শাহ আবদুল করিম এখন বাউলগানের কিংবদন্তিতুল্য মহাজন, যিনি কিনা শৈশবে ছিলেন একজন রাখাল বালক, তিনিও এই ভাটিরই মানুষ। কুষ্টিয়ার লালনের পরে এখন সর্বাধিক উচ্চারিত নামটি তাঁরই। আবার হাসন রাজার মতো এমনও ভাবুক রয়েছেন, যিনি গানের নেশায় চারিত্র্য খর্ব করে কুঁড়েঘরে থাকাটাই শ্রেয় মনে করেছিলেন। ভাটির কত কত বাউল-ফকির — দীন ভবানন্দ, দীনহীন, সৈয়দ শাহনুর, রাধারমণ, কালা শাহ, রশিদ উদ্দিন, উকিল মুন্সী, জালাল উদ্দীন খাঁ, কামাল উদ্দীন, দুর্বিণ শাহ — যাঁরা মানুষ-বন্দনা করে গেছেন আমৃত্যু। এ তো গেল ভাটি অঞ্চলের লোক ও বাউলগানের একটি ক্ষুদ্রতম পরিচিত অংশ। এর বাইরে কত শত অপরিচিত শিল্পী-সাধক লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে গেছেন, তার কোনো হিসেব নেই।

'পরিবেশটা বিপথে গেছে গা'

বাংলা গানের অসংখ্য বিচিত্র ধারার উৎপত্তি ও বিকাশ বাংলাদেশের এই ভাটি অঞ্চলে হওয়া সত্ত্বেও এদেশে ধীরে ধীরে বাউলগানের পরিসর ও ক্ষেত্রগুলি কিন্তু ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে। বাউলগান ছাড়া অপরাপর গানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ঘাটুগান হারিয়েছে সেই কবে, এমন কী উরিগান (হোরি), গাজীর গান, বটকিরাগান, টপ্পা আর মালজোড়া গানও তেমন চোখে পড়ে না। দুই-একটি গ্রাম বাদে অন্য কোথাও এসব গানের আর চর্চা হতে দেখা যায় না। যেসব গানের ধারা শুকিয়ে যাচ্ছে, তাতে জল ঢালার কাজটা করবে কারা? ভাটি অঞ্চলে সেই নিষ্ঠাবান শিল্পীরা উঠে আসছে কই? হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নির্মলেন্দু চৌধুরী, প্রাণেশ দাস, রণেন রায়চৌধুরী, দীনেন্দ্র চৌধুরীদের মতো সুরকার, গীতিকার ও শিল্পীদের উত্তরসূরিদের এত অভাব কেন?

বর্তমানে হাওরাঞ্চলের গানের পরিবেশ সম্পর্কে প্রয়াত বাউলসাধক শাহ আবদুল করিমের কিছু ব্যক্তিগত উপলব্ধি এখনও আমার কানে বাজে। তিনি বলেছিলেন, 'পরিবেশটা বিপথে গেছেগা আমার মতে। এখন ব্যবসার আলতে গেছিগি। গান লাগলে এক পার্টি জুয়া খেইড় লাগাই দেয়, পারমিশন লাগে, টিকেট লাগে, মাইরকাইজা হয়, শান্তি শৃংখলার অভাব। আগে মানুষ সারা রাত্র ঠাণ্ডার মধ্যে হাওরের মধ্যে গান শুনছে। সেই দিন আর নাই, সেই গানের পরিবেশও আর নাই। তাই সবাইরে কই, এ পথে না আসাটাই ভালা।'

একজন শিল্পী হিসেবে শাহ আবদুল করিমের এ উপলব্ধি বড়ই করুণ ও কষ্টের। যে মানুষ জীবনভর গানের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে গেছেন, তিনিই কিনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, গানের জগতে না-আসা ভালো। কিন্তু কেন? সেটাও করিমের কথাতে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। ওই যে 'পারমিশন'। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া বাংলাদেশের কোথাও কোনো যাত্রাগান, পালাগান কিংবা বাউলগানের আসর বসতে দেওয়া হয় না।

যেকোনো ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত কীর্তন ও ঢপযাত্রা (ধর্মীয় পুরাণ নির্ভর আখ্যান) পরিবেশনার জন্যও স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতির প্রয়োজন। গ্রামীণ মানুষদের কাছে এসব অনুমতির ব্যাপারটা বিশাল ঝামেলার কাজ। তাছাড়া অনুমতি চাইলেই যে সেটা পাওয়াও যাবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। ফলে ধীরে ধীরে গানের আসরের অয়োজন হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া গানের আসরকে কেন্দ্র করে একশ্রেণির মুনাফালোভী নগ্নতা ও জুয়াখেলার প্রচলন করায় গানের আয়োজনের ভাবগাম্ভীর্যে ছেদ পড়েছে, ফলে দর্শক-শ্রোতারা বিচ্যুত হয়ে গানের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। এর বাইরে গ্রাম্য-রাজনীতিও গানের আয়োজক ও শিল্পীদের অনুকূলে কখনোই ছিল না।

বাংলাদেশে হিন্দু অধ্যুষিত বসতিগুলোর মধ্যে ভাটি অঞ্চল অন্যতম। হিন্দুদের প্রতিটা আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে যেহেতু গান এবং পাঠ

অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, ফলে দেশের অপরাপর এলাকার চেয়ে ভাটি এলাকায় গানের একটা সমৃদ্ধ পরিবেশ ছিল। কিন্তু দেশভাগের পর থেকে ক্রমশ মুসলিম মৌলবাদীদের উত্থান লাভের কারণে গানের পরিবেশে বিরূপ প্রভাব পড়ে। আশির দশকের পর থেকে একই মহল অনেকটা প্রকাশ্যে গান-বাজনার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এসব কট্টর মৌলবাদী গোষ্ঠী গানের আয়োজক ও শিল্পীদের 'কাফের' আখ্যা দিয়ে অব্যাহতভাবে বাধা দিতে শুরু করে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন

কিংবা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সেসব মোকাবিলার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এতে করে শিল্পীরা ক্রমশ হতাশ হয়ে গানের জগত থেকেই সরে গেছেন।

আজ থেকে বিশ-পঁচিশ বছর আগে আমাদের ছোটোবেলায় দেখেছি, গ্রামে গ্রামে বাউলগান, ঢপযাত্রা, কীর্তন, গাজীর গান, উরিগান থেকে শুরু করে বিচিত্র ধরনের গানের আসরের আয়োজন হত। বৃহৎ পরিসরে আয়োজিত কোনো উপলক্ষ ছাড়া এসব গানের আসর এখন আর চোখেই পড়ে না। আমাদের দেখা মাত্র আড়াই দশকের ব্যবধানে কত পরিবর্তন চোখে পড়ছে। এখন ভাবি, বাবা-কাকা-দাদুদের মুখে শোনা তাঁদের সময়কার গ্রামীণ গানের আয়োজনের কথা। কিছুদিন আগে বাহাত্তর পেরোনো আমার বাবা, বারীন্দ্রকুমার দাশকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁদের দেখা গানের পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে। বাবা বলেছিলেন, 'আমার ছুটবেলায় নানা জাতের গান আইত। যাত্রা, পালা, কীর্তন, গাজীর গান, ঘাটুগান, ধামাইলগান, বৈঠকিগান, উরিগান, মালসীগান, বাউলগান, বাউলাগান সহ আরও কত লাখান গান! আমরা ইতাও দেখেছি, মা-দিদিরা নাইওর যাওয়ার আগে-পরে এবং বাবা-কাকারা পাখি শিকার উপলক্ষে গান অইত। মেঘের অভাবে ধানক্ষেত ধানক্ষেতো যখন ফাটা ধরতো, তখন বৃষ্টি-দেবতার পূজা অইত। ই নিয়া তখন বেঙাই-বেঙির বিয়া দেওয়ন অইত। বাঘাই শিন্নির গানও আছিল। এখন আর ইতা অয় না। অনেকে আগের এই সব গানের কথা জানইনও না। আমরার এই দেশ কৃষিপ্রধান দেশ, ইখানও একমাত্র বোরো ধান অয়, সেই ধানের বীজ ফালাইবার সময় চারা রোয়ার সময়সহ বিভিন্ন উপলক্ষে কৃষিভিত্তিক গান গাওয়া অইত।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'আগের কালের মানুষর কাছে যক্ষা আছিল কঠিন রোগ। এই রোগসহ নানা রোগে আক্রান্ত রোগীরার রোগ সারাইতে কিছু কিছু জাগাত গানের অয়োজন অইত। ভূত-পেরেত খেদাইতে উঝা-বৈদ্যরা ঝাড়ফুঁকের লগে গানও গাইত। বাইদ্যানিরা সাপের খেলা দেখিত আর গান গাইত। গাও-গেরাম মানেই গান-বাজনার জারা। কত কত গান আছিল, গানের ধারা আছিল, ইতা কুনতাও আর মনও নাই। গাও-গেরামের আগের সব অখন হারাইয়া যাইতাছে।'

বাবার কথার সূত্র ধরে পণ্ডিত রামকানাই দাশের কথায় আসি, যিনি ভাটি অঞ্চলের বাউলগান ও বাউলাগান সম্পর্কে তাঁর আত্মজীবনী *সঙ্গীত ও আমার জীবন* (ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১১)-এ লিখেছেন, 'বাউলাগান হল দলগত গান। প্রায় গ্রামেই বাউলাগানের দল থাকত। গানের বিষয়বস্তুতে হিন্দু ধর্মীয়

প্রভাব থাকলেও ভাবগত দিক দিয়ে ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি সার্বজনীন। প্রতিযোগিতামূলক বাউলা অনুষ্ঠানে এক গ্রামের দল অন্য গ্রামকে পান পাঠিয়ে আমন্ত্রণ জানাত। তারিখ মতে নিমন্ত্রিত দল চলে যেত সে গ্রামে। ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকত সেখানে। সারাদিন গান চলত প্রতিযোগিতামূলক ভাবে। শ্রোতারা গানের ভালোমন্দ বিচার করে শ্রেষ্ঠত্বের রায় দিত। অনুরূপভাবে, এবারের আমন্ত্রিত দল অপর দলকে ফিরতি পান-নিমন্ত্রণ দিয়ে তাদের গ্রামে নিয়ে যেত। বাউলাগানের দলকে বলা হত বাউলার দফা।'

রামকানাই দাশ আরো লিখেছেন, 'অনেকে বাউলা ও বাউলগানকে একই জিনিস মনে করে থাকেন। বাউল সংগীত হচ্ছে একক পরিবেশনায় গান যা সচরাচর একতারা বা দোতারা বাজিয়ে গাওয়া হত। পরবর্তীকালে অনেক বিশিষ্ট বাউল বেহালা বাজিয়েও গান গাইতে থাকে। বাউল গানের চর্চা গ্রামে-গঞ্জেই বেশি ছিল। বাউলগানের লোকপ্রিয়তা সর্বাধিক। অধুনা খানিক রূপান্তরিত হয়ে, গায়কি স্টাইলের কম-বেশি সমন্বয়ে জনপ্রিয় ব্যান্ডদলের মাধ্যমে নাগরিক সমাজেও এ গান বেশ লক্ষণীয় স্থান করে নিয়েছে।' একটা পরিবর্তন যে ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে, বাউলা ও বাউলগানের পরিবেশ-পরিস্থিতি যে অনেকটাই পাল্টে যাচ্ছে, তা রামকানাই দাশের এই লেখাতেই ধরা পড়ে।

একটা বিষয় লক্ষণীয়, বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, রাজশাহী, যশোর কিংবা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, নদিয়াসহ বিবিধ অঞ্চলে বাউলগান বলতে যা বোঝায়, বাংলাদেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা কিংবা কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে কিন্তু ঠিক তা বোঝায় ন। শেষোক্ত অঞ্চলগুলোতে বাউলগানের চর্চা যাঁরা করেন, তাঁরা প্রায় সবাই গৃহী। এঁরা গুরু ধরে 'ভেক'/'খিলাফত' গ্রহণ করেন না, কিংবা 'জ্যান্ত দেহে মৃতের ভূষণ', অর্থাৎ, সাদা কাপড় পরিধান করেন না। এঁরা যে কোনো রংয়ের পায়জামা-পাঞ্জাবি পরিধান করেন। নিয়মানুযায়ী অন্যান্য অঞ্চলের বাউলদের 'বস্তুনিয়ন্ত্রণ' তত্ত্বটি মানলেও এঁদের অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে তার বাস্তব প্রয়োগ ঘটান না। তারপরেও এঁদের বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠী বাউল অভিধায় পরিচিতি লাভ করেছেন। তার কারণ জীবনযাপন নয়, এঁদের গানের বিষয় ও ভাব।

হাওরের পানি কি শুকিয়ে আসছে?

শুধু যে এই গান গাইবার ক্ষেত্র ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসছে তা-ই নয়, বাংলাদেশে বাউলগানে ব্যান্ড সংগীতের এমন এক আগ্রাসী প্রভাব ঘটছে যে তার

থেকে বের হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। ভাটি অঞ্চলের প্রভাবশালী বাউলগায়ক রণেশ ঠাকুর, তিনি প্রয়াত বাউলসাধক শাহ আবদুল করিমের অন্যতম শিষ্য, দীর্ঘদিন ধরে হাওরবাসীর গানের ক্ষুধা মিটিয়ে আসছেন। সম্প্রতি এক আলাপচারিতায় তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'আইজকাইল বাংলাদেশেও দেখতাছি অনেক বাউল নামধারী অগলে গানের আসরও কি-বোর্ড আর অক্টাপ্যাড বাজাইন। ইটা খুব একটা চিন্তার বিষয়। একতারা দোতরা ছাড়া বাউলগানের চিন্তাও করা যায় না।' রণেশ ঠাকুর আক্ষেপের স্বরে বলেন, 'গত দুই বছর ধইরা আমি কলকাতার যাদবপুরও বাউল-ফকির উৎসবও যাইতাছি। ই-খানও কত খোলামেলা গানের পরিবেশ দেইখা মুগ্ধ অই গেলাম। নিজেরার ইচ্ছামতো স্বাধীন অইয়া বাউল-ফকিররা চলাফেরা করইন, নেশাভাঙও করইন। ইটা বাংলাদেশের মধ্যে অসম্ভব কথা।' একই অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন হবিগঞ্জ জেলার আজমিরিগঞ্জ উপজেলার জলসুখা গ্রামের বাউল এবং শাহ আবদুল করিমের আরেক শিষ্য, আবদুর রহমানও।

ভাটি অঞ্চলের বাউল-ফকিররা অনেকেই গান রচনা করেন। সেসব গানের মধ্যে মারফতি, বিচ্ছেদী থেকে শুরু করে ভাটিয়ালি, আঞ্চলিক ও গণসংগীত পর্যায়ভুক্ত নানান গান রয়েছে। এসব গান কেবল যে রচয়িতা কিংবা বাউল-শিল্পীরাই গেয়েছেন, তা কিন্তু নয়। বরং তা সানন্দে গ্রহণ করেছেন গ্রামের অসংখ্য লোকগান-নির্ভর শিল্পী। এবং সেই গানকে বাইরের জগতে পৌঁছে দিয়েছেন। যেমন শাল্লার পেরুয়া গ্রামের শিল্পী, স্বনামধন্য শ্রী রামকানাই দাশ।

প্রায় নব্বই বছর বয়সী সুষমা দাশ ও চন্দ্রাবতী রায়বর্মণের কথাও বলা যায়, যাঁদের জন্ম ভাটি এলাকায়। তাঁরা রাধারমণ, মধুসূদনসহ বহু প্রখ্যাত ও অজ্ঞাত লোকগীতিকারের গান শিখেছিলেন মা-দাদীদের মুখে। এখনও সেই গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এবং শুধুমাত্র গানের প্রেমেই জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসেও এঁরা কান্তিহীন সুর ফেরি করছেন দেশের ভৌগলিক সীমা ছাড়িয়ে, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের কলকাতা পর্যন্ত।

কিন্তু হাওরাঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্য থেকে এই রামকানাই দাশ, সুষমা দাশ কিংবা চন্দ্রাবতী রায়বর্মণদের যথাযোগ্য উত্তরসূরি আসছেন কই? অথচ ভাটি এলাকার এমন কোনো পরিবার নেই, যে পরিবারে অন্তত একজন সুরেলা কণ্ঠের নারী ছিলেন না। এখনও আছেন। তবু আগের মতন আর শিল্পী তৈরি হচ্ছেন না, যাঁরা এই গানকে ঘরের বাইরে এক বৃহত্তর ক্ষেত্র দিতে পারবেন। এই কারণেই কি

তবে আগের মতো ঝিম-ধরা গানের পরিবেশ আর নেই? নেই সেই শ্রোতা? না কি গানের সেই ঝিম-ধরা পরিবেশ আর নেই বলেই, তেমন শ্রোতা নেই বলেই তেমন শিল্পী আর তৈরি হচ্ছেন না? গত কয়েক বছরের ব্যবধানে ধামাইলগানের জনপ্রিয় গীতিকার প্রতাপরঞ্জন তালুকদার, বাউল কফিলউদ্দিন সরকার, শিল্পী রুহি ঠাকুর একে একে দেহত্যাগ করেছেন। কিন্তু তারপর? যেখানে বিয়ের সময় আবশ্যিকভাবে ধামাইলগান মুখ্য হয়ে উঠত, এখন তা কেবল নিয়ম মানার জন্য দায়সারা ভাবে পরিবেশিত হয়। এই যদি হয় হাওরাঞ্চলের সবচেয়ে সমৃদ্ধ গানের ধারাটির বর্তমান রূপ, তাহলে অপর ধারাগুলোর বর্তমান অবস্থা সহজেই অনুমেয়। আমাদের ছোটোবেলায়ও দেখেছি বাউলগান কিংবা যাত্রাগানের আসরের আগে পুরো দিন বাড়ির উঠোনে খুঁটি গেঁথে ত্রিপাল টাঙিয়ে এবং মেঝেতে খড়কুটো দিয়ে মঞ্চ বানানো হত। মধ্যরাতে গানের আসর শুরু হলে গ্রামসুদ্ধ নারী-পুরুষেরা হাজির হতেন। এখন গ্রামাঞ্চলে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের কাছে এই দৃশ্যটাই অনেক অর্থে বিরল।

আমাদের ভাটি অঞ্চলটা গত বিশ তিরিশ বছরে অনেকখানি বদলে গেছে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গানের পরিবেশও বদলে যাচ্ছে। হাওরের অসংখ্য চেনা-অচেনা প্রজাতির মাছ ও জলজ উদ্ভিদের মতোই বিলুপ্তির পথে রয়েছে দোতারা, একতারা, ডপকি, ঢোল, মন্দিরা, করতাল, বাঁশিসহ গানের আসরে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র। প্রযুক্তির সুবাদে গ্রামীণ মানুষের হাতে আসছে এফএম রেডিও, অত্যাধুনিক মুঠোফোনের সুবাদে এসব মানুষের কাছে অতি সহজেই ব্যান্ডশিল্পীদের রিমিক্স গান দেদারসে বাজছে। মফস্বল শহরের প্রায় বাসা-বাড়িতে ডিস্-সংযোগে হিন্দি গানের আগ্রাসনে পুরোপুরি মগ্ন তরুণ-যুবক-বৃদ্ধ, আপামর নর-নারী। অথচ এই ভাটি অঞ্চলের গ্রামগুলো ছিল বাংলা লোকগানের ঐতিহ্যবাহী জনপদ, কত শিল্পী, সাধক, কীর্তনীয়া, বাউল, ফকির ও সাধুসন্তদের বিচরণক্ষেত্র ছিল ভাটি অঞ্চলের মাটি। এ কারণেই ভাটি অঞ্চলকে বলা হত 'সুরের জন্মভূমি'। কিন্তু নামের সেই মাহাত্ম্য এখন আর চোখে পড়ে না। গ্রামীণ জনপদ মাতিয়ে তোলা বহুবর্ণিল সেই সুর আর গান কেমন যেন রঙ হারিয়ে পাঁশুটে, বিবর্ণ হয়ে পড়ছে। আমাদের আক্ষেপটা ঠিক এখানেই। তবে কি এইভাবেই অবহেলা ও সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে যাবে একটা গোটা অঞ্চলের সমৃদ্ধ গানের প্রবাহমান ধারা?

সুমনকুমার দাশ প্রথমে আলো পত্রিকার সিলেট প্রতিনিধি। লোকসংস্কৃতি গবেষক ও প্রাবন্ধিক সুমনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে হাওর অঞ্চলের প্রায় ৩০ হাজার লোকগান ও বেশ কিছু লোককবির পাণ্ডুলিপি রয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচিত ও সম্পাদিত বই *বাংলাদেশের বাউল-ফকির : পরিচিতি ও গান; বাংলা মায়ের ছেলে : শাহ আবদুল করিম জীবনী; কফিলউদ্দিন সরকারের গান; বেদে-সংগীত; বাংলাদেশের ধামাইল গান; টাঙ্গুয়ামঙ্গল* ইত্যাদি। তিনি সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ 'শাহ আবদুল করিম পদক', 'মমিনুল হক অ্যাওয়ার্ড' সহ বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি পদকে ভূষিত হয়েছেন।

হাওরে মনসার বিসর্জন। ছবি : মৌসুমী ভৌমিক
সূত্র : The Travelling Archive, www.thetravellingarchive.org

মালজোড়া গানের আসরে শ্রোতা, চন্দ্রপুর, শিলচর, ২০০৯।

মালজোড়া গান গাওন নিয়া একটি আন্দুনামা

প্রদীপ কুমার পাল

'মালজোড়া গান গাইতে গেলে কিছু পুঞ্জি যখন (থাকতে) লাগে'

লোক আসর শিলচর এবং চন্দ্রপুরবাসীর যৌথ আয়োজন 'মালজোড়া গান', শিল্পীদ্বয় হচ্ছেন শ্রী অমৃতলাল দাস, শিলচর এবং বিপক্ষে আছেন আনোয়ার হোসেন, জামিরা, হাইলাকান্দি। গানের ফাঁকে কথা বলছিলেন গায়ক অমৃতলাল — 'আনোয়ার ভাই, মালজোড়া গান গাইতে গেলে কিছু পুঞ্জি লাগে। পুঞ্জি ছাড়া মালজোড়া গাওন যায় না।' আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল মালজোড়া গানের ভিত্‌রি অর্থ। অমৃতলালের কটাক্ষ এবং তৎপরর্তিতে আনোয়ারের গান ধরা। কথা ও গানে জমে উঠেছে মালজোড়া গানের আসর।

এই অনুষ্ঠানের মাস দেড়েক পর। লোকসংস্কৃতির গবেষক তথা শিলচর গুরুচরণ কলেজের অধ্যাপক শ্রী অমলেন্দু ভট্টাচার্য আমার কাছে জানতে চাইলেন 'মালজোড়া গান'-এর অর্থ। আমি এক অনুসন্ধিৎসুহীন গানশ্রোতা, শব্দের উৎপত্তিগত ব্যাপার স্যাপার নিয়ে কঠিন কর্ম আমার নয়। অধ্যাপক-গবেষকদের সঙ্গে আমার অবস্থানগত ফারাক অ-নে-ক। প্রবল অনুসন্ধিৎসা কোনোকালেও আমার ছিল না। কিন্তু স্যারের (শ্রী অমলেন্দু ভট্টাচার্য) আন্তরিক ইচ্ছা, আমি যেন এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করি।

প্রথাগত গবেষণা পদ্ধতি আমার অজানা এবং এই অনুসন্ধিৎসার অলঙ্ঘনীয় প্রক্রিয়া অনুসরণ আমার কর্ম নয় জেনে নিজের মতো নিজের কাছে এই শব্দের অর্থ পরিষ্কার করার জন্য তালাস শুরু করলাম।

এতদিন আমার কাছে মালজোড়া গানের অর্থ ছিল তরজা গানের আরেক বাংলা সংস্করণ। আমরা জানি যে অঞ্চলভেদে নানান শব্দ-বাক্যের হরেক রকম শব্দ বাক্যগুচ্ছ আছে। মালজোড়া গান সেই অর্থে তরজা গানের অন্য বাংলা,

পার্থক্য শুধু গানের তত্ত্বালোচনা এবং পরিবেশনায়। লোকায়ত, সারস্বত এবং আধ্যাত্মিক কিছু গভীর জীবনবোধের সঙ্গে সরাসরি জড়িত তত্ত্বগুলিই নির্দিষ্ট মালজোড়া গানে। যেমন আদম তত্ত্ব, নারীর জন্ম তথ্য এবং তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের জন্মতথ্য এবং তত্ত্ব, মরিফত-শরিয়ত তত্ত্ব, বাউল-ফকির তত্ত্ব, বেহস্ত-দোজখ তত্ত্ব, ফেরেস্তা-জিব্রাইল তত্ত্ব, নারী-পুরুষ তত্ত্ব, মা ও স্ত্রী ইত্যাদি। এবং মহাভারতের প্রধান কিছু চরিত্রের দ্বৈত আলাপন, তর্ক, যেমন গান্ধারী-কুন্তী সংবাদ।

যিনি এই গানের লড়াই-এ আসবেন কিছু কিছু তত্ত্বের এবং তথ্যের ওপর তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। যেহেতু দুজনে নিজেদের মধ্যে গান- লড়াই-এ সামিল থাকেন, সে অর্থে জোড়া গায়েন। বৃহত্তর শ্রীহট্টের নিজস্ব কিছু শব্দ ভাণ্ডার আছে এবং সে শব্দগুলি আবার কলকাত্তাই শব্দার্থের বিচারে দেখলে হয়না। গায়েনরা এখানে 'মাল' এবং সে 'মাল' কখনোই ব্যাঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়নি। এভাবে গানের নির্দিষ্ট লড়াই এখানে তরজার বাইন নয়; 'পুক্ত মাল'। গায়েনরা তাই 'মাল' জোড়া। এই ছিল আমার পূর্বজ্ঞান-প্রসূত ভাবনা। এই ভাবনাকে নাড়া দিতে গিয়ে কিছু তথ্যতত্ত্ব বেরিয়ে আসে। আমি এখানে চেষ্টা করছি সে ভাবনার একটু লেনদেন করতে।

প্রথমতঃ অঞ্চল ভিত্তিক বাংলা ভাষাশব্দের, বাক্যের বিশাল উপাদানকে বাংলা উপভাষা বলতে আমি বিলকুল নারাজ। বরং সর্বজন স্বীকৃত ইংরাজি শব্দ 'ডায়ালেক্ট' (Dialect) কে অনেক বেশি নিরাপদ মনে হয়। নইলে 'উপভাষা', 'আঞ্চলিক ভাষা', 'স্থানীয় ভাষা', 'স্থানীয় কথ্য ভাষা', অনেকের ক্ষেত্রে 'অকথ্য ভাষা তথা অশিষ্ট ভাষা' হিসাবে যখন তখন শীলমোহর পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

দেখুন, পাণ্ডিত্য ফলাইবার ইচ্ছা নাই, গোস্তাকি মাফ করবেন। সেই সাহসও আমার নাই। ভাবনাগুলো 'কুনো মতে' লেখার চেষ্টা করছি মাত্র। নেহাৎ অমলেন্দু স্যার সাহস যুগিয়েছেন। নইলে মাইগো মাই! এক্কেত কটাই বামন, তার আবার সংস্কৃত উচ্চারণ।

ডাইলেক্ট-এর মহান গুণে কত অজানা শব্দ, তথ্য বহাল তবিয়তে বিদ্যমান, এর ছিঁটা-ফোঁটাও আমার জানা নাই। বৃহৎ শ্রীহট্টের মেঘনা কালনীর কূল ছাড়িয়ে একটি বহতা সংস্কৃতির আরেকটি নাম সুবৃহৎ বরাক-পার অঞ্চল। অনুমান নির্ভর কোনো তথ্যতত্ত্ব পেশ করছি না এবং অজস্র 'স্কুল অব থট'-এর অ-কল্যাণে সে পথে যাওয়াও সম্ভব নয়। সুনামগঞ্জ-হবিগঞ্জের গান লড়াই এর নাম 'মালজোড়া', গোটা বরাকেও সেটা 'মালজোড়া', এই সাদৃশ্যে অবাক হবার কিছু নাই। বরং

অমিল হলেই চিন্তার বিষয় ছিল। গায়ক শিল্পী এবং এই ধারার অনুরাগী ভক্তবৃন্দের কাছে পাওয়া তথ্য থেকে এবং গান শুনে শুনে কিছু বলার চেষ্টা করছি।

আমরা যখন 'মাল বলি'

ঢাকা-মানিকগঞ্জের সুবিশাল সুরেলা লোকসঙ্গীত অঞ্চলের পল্লীগান বিভাগের মধ্যে জনপ্রিয় একটি বিভাগ হচ্ছে 'বিচার গান'। 'বিচার গানে'র আদলে তৈরি বিশেষ ধারার আরেকটি নাম 'মালজোড়া' গান। কুশলী গায়ক গায়িকা নিজস্ব মুন্সিয়ানায় শ্রোতাকুলের কাছে গান গেয়ে বিচার বিবেচনার নিবেদন জানায়। কবিগানের মতো তর্কবিতর্ক কিম্বা মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে আসর মাতানোর পদ্ধতি এখানে অনুপস্থিত। বিশেষ একটি তত্ত্বকে মূল প্রতিপাদ্য রেখে গায়ক-গায়িকারা কখনো সখনো একটু আধটু প্রচলিত চটুলগান, স্বরচিত কিম্বা অন্য পদকর্তার গান পরিবেশন করে থাকেন। কিন্তু কোনো অবস্থায় নির্দিষ্ট তত্ত্বকে এক্কেবারে ভুলে গিয়ে নয়। এই 'মালজোড়া' গানে অংশ নিতে গেলে গায়ক-গায়িকাগণের আলাদা প্রস্তুতি প্রয়োজন। নিয়ম করে সেই চলনের চর্চা করতে হয়। নির্দিষ্ট তত্ত্বগুলি সম্পর্কে শিল্পীদের যথেষ্ট জ্ঞান-অর্জন করতে হয়। এখন যদিও 'বন্ধুত্বপূর্ণ' লড়াই-এর প্রচলনই বেশি। 'মালজোড়া' গানে আজকাল পল্লীর জুয়ার দানের আসরের কল্যাণে নির্দিষ্ট তত্ত্বের মতো নির্দিষ্ট শিল্পীজোড়া তৈরি হয়ে গেছে। এগুলি মূলত 'গটআপ'। তবে গায়ক-গায়িকাদের খেলোয়াড়ি দক্ষতায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এই গান-লড়াই।

মাতে মাত বাড়ে। মাতব্বরি মতান্তরে দৌড় মারে। গতিকে, কথান্তরে অন্য মাতে না গিয়া মোড়ে ফিরা আসি।

আমাদের এই সমসংস্কৃতির বৃহৎ সঙ্গীতাঞ্চলের অফুরন্ত শব্দভাণ্ডারের কিছু কিছু ব্যাকরণগত অর্থ 'মান্য' লিখিত বাংলা শব্দের গুণগত অর্থ থেকে আলাদা হয়। প্রয়োগক্ষেত্রেও ব্যাপক, আবার ক্ষেত্র বিশেষে একদম নির্দিষ্ট। 'মাল' শব্দের গাণিতিক অর্থ হচ্ছে 'বস্তু'/জিনিস। কিন্তু আমরা যখন বলে উঠি, বন্ধু তুমি একখান মাল বটে, তখন কিন্তু গণিত আর কাজে লাগে না। মাল শব্দের বহুল প্রচলন, বহুধা প্রয়োগ বৃহৎ বাংলায় বহুকাল ধরে। বুমকুমা নারীর প্রতি পুরুষদের নিক্ষিপ্ত কটাক্ষশব্দ 'মাল'। তা ঠিক কী অর্থ বহন করে সেটা উল্লেখের প্রয়োজন নাই। আবার যেমন মাল, পয়মাল ইত্যাদি। যেহেতু 'মাল' শব্দটি ভারতীয় উপমহাদেশের সম্পদ যা কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহার হয়ে আছে, বৃহৎ

বঙ্গে এই শব্দটি ঠিক কোন ভাষার উৎস-সম্পদ সেটা নিয়ে ভাষাবিদ্‌দের লিখিত আলোচনা আছে বলে আমার বিশ্বাস।

বৃহৎ কাছাড়ে একটি প্রচলিত খেলার নাম মালযুদ্ধ। এই মালযুদ্ধ হচ্ছে মল্লযুদ্ধ। এবং সেটা দক্ষিণ-পশ্চিম গ্রাম কাছাড়ে এখনো বলা হয়ে থাকে। আবার ধরুন 'মাল মশলা'। 'ভিত্তরে কিছু মালমশলা থাকলেত বাড়াইত'। এখানে 'মাল' মানে বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান, সুতরাং কোনো দ্বিধা না রেখেই বলা যায়। কোনো ব্যাঙ্গার্থে নয় বরং ডায়ালেক্ট ম্যাজিক মেনেই 'মালজোড়া' গান সদর্থে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। এটা ভাষা-সম্পদ। 'তরজা', 'দরজা' লড়াই-এর 'উপভাষা' বলে বলে এটাকে ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়োজন নাই। এমনিতেও রসকষহীন 'তরজা' বাইন থেকে 'মালজোড়া' গাইন রসিক জনোচিত এবং অনেক বেশি রসোদ্দীপক।

লেখন্যা নাইলে যিরম হয় আরকি। 'গাফিসা' মাতে মত্ত হইয়া অগবেষকী পাতলা মাত কথায় চলে গেছি। যাই হোক, অনেক সঙ্গীত শিল্পী এবং রসিক গানভক্ত মনে করেন 'ঘাট্টা'র গান আর মালজোড়া প্রায় একই বস্তু। কিন্তু 'ঘাট্টা' মানে তো ঘাউঠ্যা বা ঘাঠু গান। ডায়ালেক্ট এর মাহাত্য রে বাবা। ডায়ালেক্ট মেনে উচ্চারণ না হলে মজা লুটন্ দায়। আমি বারবার ডায়ালেক্ট শব্দ উচ্চারণ করছি ইচ্ছা করেই। আমার নির্দিষ্ট এবং পরিমিত পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ায় ডায়ালেক্ট শব্দের উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাইনি। যদি কেউ এই শব্দের সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করে থাকেন বা জানেন তাহলে এই অধমকে অবগত করুন এবং চিরকৃতজ্ঞায় আবদ্ধ রাখতে সাহায্য করুন। উপভাষা, আঞ্চলিক ভাষা ইত্যাদি শব্দগুলি গোটা ভাষারই অংশ এবং এগুলির ব্যবহার একটা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে। অনেক শব্দের গুণগত অর্থ মান্য/চলিত ভাষায় (মূল অর্থকে বজায় রেখে) অনুবাদ করা প্রায় অসম্ভব। অক্সফোর্ড এ্যাড্‌ভান্স লার্নার অভিধান অনুযায়ী — ডায়ালেক্ট একটি বিশেষ ভাষার উচ্চারণ, ব্যাকরণ এবং শব্দগুচ্ছের ভাষাভঙ্গী। কোনো একটি অঞ্চলের প্রচলিত উচ্চারণ ব্যাকরণ এবং শব্দগুচ্ছ অন্য অঞ্চলের ভাষ্যভঙ্গী থেকে আলাদা থাকে। সেটাকেই ডায়ালেক্ট বলা হয়।

ঘাঠু গান যে আসলে 'মালজোড়া' গান নয়, সেটা পরবর্তীকালে 'মালজোড়া' গান জনপ্রিয় হওয়াতেই বোঝা যায়। ঘাঠু গানে বিশেষ কোনো তত্ত্বতালাস নেই। মালজোড়া গানে তত্ত্বতালাস প্রধান উপকরণ। সঙ্গে অবশ্যই আছে 'আসর

জমাইবার' মাল মশলা। প্রাচীন কাছাড়ের ঘাঠু গানের কিছু অনুষঙ্গ মিশেল হয়েছে বৃহৎ শ্রীহট্টের মালজোড়া গানে।

সদর সিলেট ও ভাটি

সদর সিলেটি এবং এর ভৌগোলিক অঞ্চল ও বাচনভঙ্গী দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল সহ বাদবাকি বৃহৎ শ্রীহট্ট (সিলেট) ও তার ভূগোল ও বাচনভঙ্গী। বিষয়টা বিশাল এবং বেশ গোলমেলে। শুধু একটু ছুঁইয়ে যেতে চাই, আলোচ্য বিষয়ের কারণে। গোটা বঙ্গবাসীর যেমন ঢাকা- কলকাতা। বৃহৎ শ্রীহট্টের তেমন সদর সিলেট। এই সদর সিলেটের প্রভাবমুক্ত অঞ্চলগুলি মূলতঃ ভাটি অঞ্চল ও হাওর অঞ্চল। এবং এর সঙ্গে যুক্ত আছে সে অঞ্চলের উপসদর অঞ্চল। চিরকাল সুনামগঞ্জের সুবৃহৎ হাওর অঞ্চল এবং হবিগঞ্জের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সদর সিলেটের সাথে যত না যোগাযোগ ছিল, তার থেকে অনেক বেশি সাংস্কৃতিক যোগসূত্রতা ছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের সাথে। তবে, ক্রমশ উজানে সিলেটিদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে সদরের কাছে অনেক অজানা সঙ্গীত ধারা ও উপস্থাপনা প্রকাশিত হতে থাকে। ভাটি থেকে ক্রমশ উজানে আসা একটি নবীন মহার্ঘ সঙ্গীত অনুষ্ঠান, অর্থাৎ মালজোড়া গান, অতি অল্পকালের মধ্যেই লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, বিষয়গত দুর্বলতা এবং মূলত দু-একটি সাধারণ সুর এবং জটিলতম তাল কেরামতিকে হাতিয়ার করে ঘাঠু গান বেশি দূর অব্দি চলতে পারেনি। ঘাটু এখন প্রায় নেই বললেই চলে। আরেকটি বিষয় লক্ষ করার মতো, মালজোড়া গানের উৎপত্তিস্থল শ্রীহট্টের ভাটি অঞ্চল পার হয়ে উল্টো দিকে চলে আসা বসতির সঙ্গে এই গানও ভ্রমণ করেছে নিয়ম মেনে, এবং এই গান-পরিক্রমায় সাথী করে নিয়েছে সদর সিলেটি বোলচালের বৃহৎ শ্রীহট্ট কাছাড়কে, সঙ্গে পেয়েছে এক সময়ের ফকিরি আর অন্য লোকায়ত সঙ্গীতে ধনধান্যে পূর্ণ 'কাছাড় সিলেটি'র গুণী সঙ্গীতবর্গকে। নিম্নকোটি জনমানসে একসময় সঙ্গীতের সুর প্রাচুর্যের কারণে, সহজ জীবন বোধের তত্ত্ব কথার কারণে মালজোড়া গান একটি বিশেষ স্থান গড়ে নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ধর্মীয় কারণে গোটা কাছাড় জুড়ে ফকিরি গানের ওপর মহাপ্রলয় ঘটে যায়। নিম্নকোটির আশ্রয়স্থল পীরের মোকামগুলিতে পীর পরবর্তীকালে ধর্মীয় বিধিনিষেধ বলবৎ হয়। ফলস্বরূপ পরাণে ধরে রাখা গান তলানিতে পৌঁছে গেছে এখন।

কিন্তু, প্রথম যখন এই গান আসে, সে-সময় পূর্ববঙ্গ, পূর্বপাকিস্তান-বাংলাদেশ থেকে আসা (বিশেষ করে বৃহৎ শ্রীহট্ট থেকে) মানুষদের মধ্যে কিছু কিছু গায়ক-গায়িকা নিজেদের গান চর্চার সংগ্রামও চালিয়ে যান। আস্তে আস্তে করে দুই অঞ্চলের গায়কিয়ানার মহামিলন ঘটে। সুর বৈচিত্রে পুষ্ট হয় 'মালজোড়া' গান।

পালাগানের যেমন একটি বৃহৎ অঞ্চল ছিল, ঘাঠু গানেরও একটি ছোট অঞ্চল ছিল। পালাগানের মূলতঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ-বানিয়াচঙ্গ-কুমিল্লা অঞ্চল। 'ময়মনসিংহ গীতিকার' এই বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গীতমালা, পরবর্তীকালে বৃহত্তর শ্রীহট্টের মধ্যে তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এখানে একটি মজার ব্যাপার হল সুনামগঞ্জ হবিগঞ্জের একটা বৃহৎ সঙ্গীতাঞ্চল আংশিক ভাবে ময়মনসিং এবং শ্রীহট্টের নিজস্ব সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। ফলে এই অঞ্চলের সঙ্গীতধারা এই দুই মহান সুরসঙ্গীতের পরশে পুষ্ট হয়ে ওঠে।

মালজোড়া গানের শরীর

বেশি মাতে বেরাছেরা লাগে। আমার মতো আন্দু জুড়িয়া বাওয়া ব্যক্তির পক্ষে কম মাতে মেইন বিষয় পরিষ্কার করা একদম অসম্ভব। কলমচিন্তার এই জোরও নাই, আবার চিন্তা আছে। মহাজন জালাল খাঁ ছাহেব গাইয়া থুইয়া গেছেন, 'বেশি কথা বলিস নারে, বেশি কিছু ভালো নয়...'

শ্রীহট্টের এই মালজোড়া গানের অঞ্চলকে ঘিরে একটি সুবৃহৎ সঙ্গীতাঞ্চল আছে। সেই কথাই এই গল্পের মধ্যে বলার চেষ্টা করে আসছি। মালজোড়া গানের শরীরে বৃহৎ বঙ্গের যে সব লোকসঙ্গীতের উপাদানগুলি সরাসরি প্রবেশ করেছে সেগুলি হচ্ছে (১) পালা গান, (২) বিচার গান, (৩) ঘাঠু গান, (৪) তরজা গান, (৫) বাউলা গান, (৬) ফকিরি গান। এবার এই উপাদানগুলি নিয়ে একটু বিশদ হওয়া যাক। তথ্যতত্ত্বাদি ভ্রান্তির (যদি লক্ষণ দেখা যায়) অঙ্গুলী নির্দেশ অগ্রিম কামনা করছি।

(১) পালা গান : বৃহত্তর ময়মনসিং আর শ্রীহট্টের এই পালাগানের ইতিহাস সুপ্রাচীন। বিভিন্ন পদকর্তা, পালাগান রচয়িতা এবং গায়েন কর্তৃক পরিবেশগুণে বহুমাত্রিক শিল্পগুণে আরো ব্যাপ্তি ঘটেছে এই সঙ্গীত ধারাটির। সুর লালিত্যে রাত্রি ভোর হয় এই পালাগানে। শ্রীহট্টের পশ্চিমে অবস্থান করে আছে লোক গাঁথা আর পালাগান-সুরের মহা পীঠস্থান কিশোরগঞ্জ। উত্তর-পশ্চিমে আছে নেত্রকোণা। এবং দক্ষিণে ভৈরব মাধবপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সুনামগঞ্জ-হবিগঞ্জের লোকসুর এবং

সঙ্গীতে বৈচিত্র এসেছে এই সমস্ত সঙ্গীতাঞ্চলের নৈকট্যে। পরিযায়ী সঙ্গীত ভুবন পুষ্ট হয়েছে, হৃদ্ধ হয়েছে।

(২) ঘাটু গান : বাংলাদেশের সঙ্গীতের এই বিশেষ সম্পদটি এখন লুপ্তপ্রায় প্রজাতিভুক্ত। ঘাটুয়া বা ঘাটু গান মূলত হাওর প্রধান অঞ্চলের সঙ্গীত পরম্পরা। তালবাদ্যের প্রাধান্য বেশি। বিশেষ করে বাংলা ঢোল, ঢোলক এবং ঢোলকি। তাল প্রধান এই ঘাটু গান পরিবেশনে বাদকের দক্ষতা এবং সঙ্গে গায়কের পরিবেশনা প্রায় প্রতিযোগিতার পর্যায়ে চলে যায়। তালবৈচিত্র্যের ঘাটুগানের আসর মূলত বৈঠকি মেজাজের আসর। তার মানে কিন্তু তথাকথিত বৈঠকি সঙ্গীত নয়। দুই দল থাকেন একদল গান ছাড়া মাত্রই আরেক দল সেই তালের নির্দিষ্ট মাত্রা বাদ দিয়ে সম থেমে সমবেত ভাবে গান লুফে নেন। নিরপেক্ষ ওস্তাদ বাদক একজন থাকেন। তালবাদক এই ওস্তাদকে অনুসরণ করেন বাকি শিল্পীরা। ঘাটু গানে একজন কিশোরকে ঘাটু অর্থাৎ সং সাজিয়ে রাখা হয়। সে প্রত্যেকটি গানের সঙ্গে, তালের সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী করে আসর মাতিয়ে রাখে।

(৩) তরজা গান : উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ গোটা পশ্চিমবঙ্গে কম-বেশি জনপ্রিয় এই তরজা গান। আমরা সবাই জানি 'তরজা' কথার সাধারণ অর্থ, বাঁশকে ফাটিয়ে দা দিয়ে ফালা ফালা করে বাঁশের বেড়া তৈরি করার শিল্পকর্মের নাম 'তরজা বাইন'। তরজার পিঠে তরজা ফালি দিয়ে তৈরি হওয়া এবং কথার পিঠে কথা সাজিয়ে তৈরি হওয়া 'গাইন'। প্রশ্নত্তোরমূলক এই গানে মিশ্রণ হয়েছে বাউলতত্ত্বের বিভিন্ন জটিল ধাঁধা। অন্য হালকা রসের চটকদারি বেলেল্লাপনা যে নেই তা বলছি না। কিন্তু সেটা অন্য প্রসঙ্গ, অন্য অংক। সার্বিক 'পরিকল্পিত' গোছানো পরিবেশনার প্রতি মনোযোগ বেড়েছে (খেপের কারণে) ফলে প্রকৃত অর্থে গুণি শিল্পীদের কদর কমেছে।

(৪) বাউলা গান : কোন সন্দেহ নেই 'বাউল' শব্দের অন্য ডায়ালেক্ট। এখানেও সেই বোলচাল না মেনে উচ্চারণ হলে 'মজালুটন' দায়। বাউল তত্ত্বের গান, অথচ বেশিরভাগ হিন্দু জনগোষ্ঠীর বৃহৎ শ্রীহট্টবাসী সেই গানের মধ্যে কীর্তনের 'হলাহল' মিশ্রণ ঘটিয়ে 'বাউলা কীর্তন' করে দিয়েছেন। ফলে কী কীর্তন আর কী বাউলগানের 'আসর', প্রায় একই রকম লাগে। এই ধরনের গায়েনরীতি একঘেয়ে। দীর্ঘক্ষণ ধরে শুনলে মনে হয় সারাক্ষণ বুঝি একটি গানই গাওয়া হল। ঠিক এই প্রচলনের বিপ্রতীপে এক বিশাল সঙ্গীত প্রচলন বৃহত্তর সিলেটের আদি অনন্ত গৌরব। সেটাও শ্রীহট্ট কাছাড়ের বাউলা গান। গোটা বৃহৎবঙ্গের সবচেয়ে

বৈচিত্রপূর্ণ সুর এবং সহজসরল তত্ত্বের বাউলা গান। 'বাউলা' শ্রীহট্ট কাছাড়ের বহু প্রাচীন শব্দ সন্দেহ নেই। বেশি হয়ে যাবে কিনা জানি না। আমার তো মনে হয় বাউল শব্দের অর্থ খুঁজতে গিয়ে বাংলার তাবদ পণ্ডিত গবেষকগণ যে সব শব্দ বাক্যের তুবড়ি ছুটিয়েছেন, এই 'বাউলা' যেন তুড়ি মেরে হেসে খেলে বাউল শব্দমাহাত্য নিজ গুণে বুঝিয়ে দিয়েছে। সুধী রসিকজন, একটু ভাবুন তো (তবে অবশ্যই উচ্চারণ ম্যাজিক ঠোঁটে, মাথায় রেখে নয়) বাউলা, বাউল্যা, বাউলামি, বাউলামানুষ, বাউটামি এবং আউলা ঝাউলা ইত্যাদি ইত্যাদি। বৃহৎ শ্রীহট্টের বর্তমান সুনামগঞ্জ জিলা, হবিগঞ্জ জিলা এবং বৃহৎ ময়মনসিং এবং বর্তমান নেত্রকোণা জিলা — কিশোরগঞ্জ জিলার প্রায় মাঝধারা হয়ে বহতা একটি নদীর নাম বাইলাই। শব্দমাহাত্যে বিচার করলে 'বাউল্যা' অঞ্চলের এমন জুৎসই একটি নদীর অন্য নাম আর কী হতে পারে? লোকগানের আদি অনন্ত নিরন্তর সাক্ষী বহতা নদ-নদী। রূপকথার গল্পের মতো মায়াবী নদীগুলির দানবিক রূপ থেকে শুরু করে ক্ষীণতোয়া হত দরিদ্র চেহারা। সব কিছুই যেন রহস্যময়। বরাকের জন্ম দেওয়া দুই কন্যা, সুরমা-কুশিয়ারায় বিচ্ছেদ এবং নানা ঘাটের জলপানী খেয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমণ শেষ করে আবার দুই বোনের মহামিলন। কালনী রূপ ধারণ করে, ভৈরবকে সাক্ষী রেখে পুরানো ব্রহ্মপুত্রের পানি গ্রহণ এবং শেষে মেঘনায় রুদ্রাণী হওয়া। প্রকৃতির মহাবিস্ময়। সুরমা-কুশিয়ারার গোটা লীলাখেলা সাঙ্গ হয়েছে এই বৃহৎ শ্রীহট্টের সীমারেখার মধ্যে। বাউল ভাবান্তরে, জাগতিক ভাবুকপ্রাণে এই ভব নদীতরঙ্গ প্রবাহ এবং পরিক্রমণ কি যথেষ্ট নয়? প্রকৃতিকে ছেড়ে সঙ্গীতের জন্ম হয় না, সাধনাও হয় না।

ভাটিয়ালী থেকে শুরু করে সারিগান, নৌ বইচের গান হাওর বাওর নদীর খালের জন্মযোদ্ধা মানবকুলের দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হওয়া দীর্ঘশ্বাস আরো প্রলম্বিত হয় সুর বিস্তারে। গায়কের স্বকীয়তায়, সাধনায় একেকটি ঘরানা তৈরি হয়। এখানে কোনো হিসাব নেই কোনো লিখিত পরম্পরা নেই। ছোটো ছোটো অঞ্চল ভেদে তৈরি হয়েছে একই গানের ভিন্ন পরিবেশনা। গুণী মহাজনদের এত বিশাল সমাহার একটা সময় জুড়ে এই বাংলার সঙ্গীতাঞ্চলে একটা সঙ্গীত বিপ্লব ঘটিয়েছিল। বাউলা গানের গুণী গায়েনরা তৈরি হয়েছিলেন সেই মহাজন পদকর্তাদের চর্চাশ্রয়ে। বাউলা গানের অগ্রণী শ্রেণির গায়েনরাই মূলত মালজোড়া গানের প্রচলিত শিল্পী।

(৫) ফকিরি গান : 'ফকির মেলা' বলে এই বৃহৎ বরাক অঞ্চলের একটি 'গান জলসা' অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। সাধারণত মেলা বলতেই একটা জনসমাগমের চিত্র আমাদের চোখে ভাসে, বর্তমান প্রচলন এই 'মেলা'কে কিন্তু সেই অর্থে মেলা বলা যায় না। বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিহাস বর্ণনায় কোথাও উল্লেখ আছে কিনা জানিনা, এই আদি কাছাড় কিন্তু ফরিক সঙ্গীতাঞ্চল। এক সময়ের সঙ্গীতের মুক্তাঞ্চল। শাহজালালের অন্যতম আউলিয়া খাকি শাহ শুধু বদরপুর পর্যন্ত (ইসলাম ধর্মের প্রচারক হিসাবে) যাত্রাপথ শেষ করতে পেরেছিলেন। কোনো অজ্ঞাত কারণে পূর্বে (উত্তর পূর্ব কাছাড়) পরিক্রমার কোনো প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। সে কারণেই হয়ত একটা বড়ো অংশ শাহ্জালালের 'প্রচার স্পর্শ' পায়নি। পীর ফকির সম্মিলিত লোকায়ত সংসার ধর্ম, আচার পার্বণ আর ফকিরি — বাউল তত্ত্বের প্রতিনিয়ত আনন্দ বিনোদন। এই নিয়ে মহানন্দে 'জিইয়ে' ছিল গোটা কাছাড়। পীরদের ছত্রছায়ায় ফকিরগোষ্ঠী আর সঙ্গীতপ্রাণ মানুষ। বাউল ফকিরদের তো গান ছাড়া জীবন নেই। ফলে নিত্যনতুন গান আর সুরের মায়াজাল। পরবর্তীকালে ব্যাপক অনাচারের ফলে এই মরমীয়া গান সাধকদের সংখ্যা অসম্ভব দ্রুততায় প্রায় শূন্যের ঘরে চলে আসে। কিন্তু এর মধ্যেও কিছু কিছু শিল্পী টিকিয়ে রেখেছেন নিজেদের সঙ্গীতচর্চা। এবং এঁদের বেশির ভাগই সনাতন ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সমঝোতা করে। এহেন পরিস্থিতির মধ্যে ফকির মেলা নাম নিয়ে যে আসরগুলো বসছে সেগুলো মূলত গ্রাম কাছাড়ের কিছু সঙ্গীত রসিকজনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে — কারুর বাড়িতে, নির্জন মোকামে। উচ্চবর্গের মুসলমানের মধ্যে কিছু সঙ্গীতপ্রেমী ব্যক্তি মাঝে মাঝে নিজেদের বাড়িতে 'ফকির মেলা' করান। কিন্তু সেগুলি মূলত কোনো লোকায়ত অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যেমন গৃহ প্রবেশ ইত্যাদি, যেগুলি মূলত জিকির। বাড়িতে অশরীরী কুলক্ষণ ঘটনা ইত্যাদি বিদায় করার মানসে অনেক সময় বাড়িতে ফকির/জিকির মেলা বসান হয়। হিন্দুদের যেমন লোকায়ত তিননাথের মেলা (কীর্তন) মুসলমানদের তেমন ফকির মেলা। এখানে একটি মিল আছে, সেটা হল সংখ্যাগুরু নিম্নকোটির এবং ব্রাত্যজন মানুষের একান্ত নিজস্ব অনুষ্ঠান এই মেলাগুলি। 'ফকিরমেলা'র গানগুলির মূল গন্তব্য যেহেতু জিকির, সে কারণে প্রথম থেকেই একটা 'ঝুঁকি' তৈরি হয় তালের এবং কিছুটা হলেও সুরের। ফকিরি গানের কিছু বিশেষজ্ঞ গায়কদের সময় বিশেষে মালজোড়া আসরে যোগদানে মালজোড়া গানে অনেকটা বৈচিত্র্য আসে।

উপসংহিতা

এতক্ষণ ধরে চলা এই 'আজাইর‍্যা পেছাল'কে এবার একটি সমঝোতায় আনতে হয়। আসর জমাইবার মতো এর থেকে বেশি মাল আমার পুঞ্জীতে নাই। আলোচনাটাকে এবার এক কলমে দাঁড় করাতে হয়। উল্লেখিত বাউলা, পালা, তরজা, ফকিরি, বিচার এবং ঘাটু গানের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে তৈরি হয়েছে বৃহৎ বঙ্গের সর্বকনিষ্ঠ লোক/পল্লী গান 'মালজোড়া' গান। শিল্পের বিস্তার এবং পরিবর্তন-পরিবর্ধন মেনেই লোকশিল্পের/লোকগান অনুষ্ঠানের জন্ম হয়েছে। লোকগানচর্চার, তত্ত্বমূলক গান চর্চার নিয়ত (সংখ্যায় কম হলেও) অনুশীলন না হলে নয়া আঙ্গিকের জন্ম হয় না। লোকগান নিয়ে হাহাকার করনেওয়ালাদের ভরসা দিয়ে যেতে পারে এই 'মালাজোড়া' গানের জন্ম। পালাগানের দীর্ঘায়িত ব্যাপ্তি। বিচারগানের বাহ্যিকতা এবং গায়কী মুন্সিয়ানা। ঘাটু গানের কিছু তাল বৈচিত্র্য, চুটল ইঙ্গিত। তরজা গানের পরিবেশনার আঙ্গিক। বাউলা গানের তত্ত্বালোচনা, সুবিস্তার, মহাজনীগান। ফকিরি গানের তাল-লয়ের ঝোঁক এবং ফকির মহাজন রচিত সুরেলা বহুল প্রচলিত তত্ত্বগান। এ সমস্ত মিলে তৈরি হওয়া এই মালজোড়া গান। এই সম্পদগুলি নিয়ে সুচিন্তিত ভাবে একা এবং কয়েকজন মিলে এই সঙ্গীতমহার্ঘের জন্ম দিয়েছেন এই ভাবনা থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য আমার এই সাতকাহন।

তত্ত্বগানের দুই পুঞ্জীয়ালার যথেষ্ট গানের আর তত্ত্বের মালমশলা 'রাখন' লাগবো। এখানে গানও মাল তত্ত্বও মাল আর বুকের 'ফাডা' লইয়া গায়ক পার্টি তো মাল বাটেই। 'নিত্য' মালদারেরা তো এখানে মালজোড়া হবেন। সেটাই স্বাভাবিক। কি বলেন সুধী পড়ুইয়্যারা? উপ হোক আর অপ হোক, সংহারে আমার প্রবল অনিচ্ছা। উপসেবন মনামার। এই উপদ্রুত উপপুরাণকে উপসংহারে উপনীত করাটা সমীচীন হবে না জেনে শ্লাঘাবোধ করার মতো একখান উপসংহিতা পেশ করলাম। রচনা নাম নেওয়া এই 'আধখেচরা' মালটাকে একটু জুৎ ধরাতে চেষ্টা করলাম, এই গৌরবে 'জিনকি' উঠা এখানেই ইতি।

প্রদীপ কুমার পাল শখের শব্দযন্ত্রী। শিলচর শহরে তাঁর একটি রেকর্ডিং স্টুডিও আছে। তিনি ঘুরে ঘুরে অঞ্চলের গান সংগ্রহ করে বেড়ান।

মালজোড়ার আসরে গান গাইছেন অমৃতলাল দাস।
সৌজন্য : প্রদীপ কুমার পাল

কারবালা যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিচিত্র। উত্তর ২৪ পরগণার একটি মহরমের মেলা থেকে সংগৃহীত।

মা ফতেমার সাধের ছেলে পড়ে কেন ধূলাতে
শিয়া শোকগাথার সন্ধানে

ঈপ্সিতা হালদার

শুরুর দিকে যখন আমি মহরম নিয়ে খোঁজপাত শুরু করি, আমার বাবার ফিজিওথেরাপিস্ট জানান যে ওঁদের এলাকায় কিছু সিডির দোকান আছে, ওইখানে পাওয়া যেতে পারে কোনোকিছু, কেননা ওই এলাকায় বেশ কয়েকটা তাজিয়া বেরোয় মহরমের দিন, [১] অর্থাৎ, শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন ওই অঞ্চলে। [২] চাতরা বাজারে নেমে ঢালুপথে একটু বাঁয়ের গলিতে শেষ অবধি পাওয়া গেল। হুসেইনী ক্যাসেট কালেকশন সেন্টার। আধা গ্রাম, আধা মফস্বলের চূড়ান্ত বাংলানির্ভরতার মাঝখানে ... আসগর আলির উর্দু নওহায় ঠাসা দোকানখানা দেখলে তাক লেগে যায়। নওহা, [৩] অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী শোকগাথা। যিনি নওহা পড়েন, তিনি নওহাখান। অবশ্যই সবই পাইরেটেড। ছোট্টো একটা টিভি সেট রাখা তাকের ওপর, কিছু তাক প্লাইয়ের সাদা রং করা, কিছু কাঠই। ভিসিডিতে আসগর আলি চালিয়ে রেখেছিলেন একটা ধর্মোপদেশমূলক কিছু, যাতে B&W-এ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম উলেমাকে, আর উলেমার বক্তৃতার মাঝে মাঝে ইরাকের পবিত্র ধর্মীয় স্থানগুলি দেখানো হচ্ছিল শট জুড়ে জুড়ে। উলেমার আরবি বক্তৃতা একবর্ণ বুঝতে না পারলেও আমি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে দেখলাম আমাকে নতুন পেয়ে সব্জির বাজার, মুদিখানা, ইলেকট্রিক্যাল গুডসের দোকান থেকে যে দু'পাঁচজন দোকানদার আর জোগাড়ে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা অতি অভিনিবেশে ওই আরবি বক্তৃতা শুনছেন। ওঁরা ছোটো কাঁচের গ্লাসে চা খাচ্ছিলেন, যা দু'মিনিটের মধ্যে আমারও হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় একটা। প্রচণ্ড কড়া চিনি দেওয়া চায়ে চুমুক দিতে না দিতে স্পষ্ট হয়ে যায় সবটা। আমার চা-পানরত সাথীরা, যতই চায়ের গ্লাস হাতে মুখ নিচু করে শুনুন। আমার মতোই, আরবি বক্তৃতা বুঝছেন না একবর্ণও।

প্রথম প্রশ্ন ছিল, তাহলে আরবি বক্তৃতা বাজছে কেন?

আসগর ভাই বলেন, 'না বুঝি, শুনলে একটা মুড তৈরি হয়, বুঝলেন না? এই মহরম মাসে। বাংলা নওহাও আছে। বাজাই তো। ওগুলো লোকাল।' ভিড় করা লোকগুলির একজন বলে ওঠেন, 'মহরম মাসে কোনো শিয়া গ্রামের পাশ দিয়ে যাবেন যেই, ধরুন দুপুরের পর, শুনতে পাবেন হয় নআ [৪] বাজছে বা পড়ছে গ্রামের লোক। পড়বেই। নআ না পড়ে মহরম হয় না।'

আসগর ভাই বলে ওঠেন, 'লোকাল কবিরাও আছেন যাদের বাংলা নওহা খুবই পপুলার। বাংলা নওহার সিডির প্রায় পুরোটাই পাকিস্তানি নওহার দেখাদেখি এলাকার স্টুডিওতে রেকর্ড করে বিক্রি করা হয়। পাকিস্তানি নওহার মতোই সেগুলো ব্লু টুথের মধ্যে দিয়ে হাতে হাতে ঘুরতে থাকে, মোবাইলে। মহরমের আগেই স্টক ফিনিশ হয়ে যায়। দশ তারিখের [৫] পরে খোঁজ করবেন। একটাও পড়ে নেই দেখবেন।'

বক্তৃতার সিডি বদলে পাকিস্তানি নওহাখানের একটা ডিভিডি চালান আসগার ভাই। এটা নাদিম সারওয়ার, সমস্বরে বলে ওঠে জড়ো হওয়া জনতা।

'যদি না পড়ে কেউ, শুধু শোনে, তাহলেও হবে।' [৬] বলে ওঠে।

ওঁরাও শুনছিলেন। কাজের মাঝখানে ধুলোবালি লাগা পোষাকে, অল্প ময়লা হাতে কাঁচের গ্লাস ধরে। কিন্তু সময় ও স্থান কোনোটিই ঠিক পবিত্র নওহাপঠনের উপযুক্ত ছিল না, কিন্তু এই কাজের ফাঁকে অস্নাত তদ্‌গত মুখে টিভির সামনে ভিড় জমানো, কখনো মাথা নিচু করে বুক চাপড়ানোর মৃদু ভঙ্গী, একটা নওহা শেষ হলে অস্ফুটে পড়ে ওঠা কোরাণের বিশেষ কোনো বয়েত যেন বা ভিন্ন এক রিচ্যুয়াল, ভিন্ন এক পবিত্রতা তৈরি করছিল।

যেসব বাংলা নওহা সিডি হয়েছে নতুন, সবই প্রায় পাকিস্তানি উর্দু নওহা থেকে। তক্ষণি জিজ্ঞসাটা তৈরি হল, তাহলে, এই আমদানি হওয়া সিডি-ডিভিডি সংস্কৃতি, যা কিনা কোনো লাহোরের সঙ্গে নিমেষে যুক্ত করে দিচ্ছে উত্তর ২৪ পরগণার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল, তার ফলে নওহা পঠন ও শ্রবণের কি নতুনতর তারকা তৈরি হচ্ছে। তার ফলে শিয়া সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীচেতনায় কোনো পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে কি না আদৌ। ভাবছিলাম, নওহা পঠন-শ্রবণের মধ্যে দিয়েই যেহেতু নির্মিত-নির্ণীত হয় শিয়া সম্প্রদায়ের যৌথতা, যেসব নওহা গাঁয়ে গঞ্জে বহু প্রজন্মে প্রচলিত, তার সঙ্গে এই নিউ মিডিয়া জনিত যে অভিব্যক্তি, যা কিনা বিশ্বায়নের এক সবিশেষ অভিক্ষেপ, তাকে মিলিয়ে দেখলে বদলের কী চিহ্ন চোখে পড়ে? [৭]

হায় হোসেন হায় এ কী হলো।

এই যাত্রা শুরু হয়েছিল গল্পের সন্ধানে। ললিত বাহুওলা নিষ্কলুষ নায়ক অবহেলে মেরে ফেলছে দশমুণ্ডধারী রাক্ষস, এই প্রবণতা থেকে ভিন্ন কোনো কিছু ছিল ওই কাহনে যেখানে নায়ক স্বয়ং তৃষ্ণার্ত এবং সদলে হত ধূ ধূ মরুভূমি মাঝখানে, যেখানে জলের স্রোত ঘুরিয়ে শত্রুবাহিনী শুকিয়ে দিয়েছিল ফোরাত নদীর খাত। [৮] জলের তৃষ্ণা ও তার বোধ তৈরি করেছিল কাথারটিক মুহূর্তগুলি, বার বার। শুরু হয়েছিল খুব ছোটোবেলায়। রাত্তিরে তারার আলোয় বাবার আখ্যানে এক তৃষ্ণার্ত বাবা ছেলেকে কোলে করে শত্রুবেষ্টিত নদীতে জল খাওয়াতে এলে শত্রুর তীর শিশুটির বক্ষ ভেদ করে দেয়। পরে বাবার মুখে শোনা এই যুদ্ধকাহিনীটি খুঁজে পাই ১৮৮৭ সালে ছাপা একটি গ্রন্থে, নাম যার *বিষাদসিন্ধু*। *বিষাদসিন্ধু*-তেই বাংলাগদ্যে প্রথম কারবালার কাহিনী লেখা হয়। যদিও আমার বাবার কারবালার কাহিনী, প্রতিটি মৌখিক উচ্চারণের মতো ছিল, স্থানে স্থানে বাহুল্যসমৃদ্ধ, স্থানে স্থানে বর্জিত। পাশাপাশি মধ্যযুগে বাঁধা কারবালাকাব্যের পুঁথি পড়ে স্মরণ রাখতে হয় যে এই পুঁথিগ্রন্থিত আখ্যানগুলি কিছুতেই স্মরণের জীবন্ত প্রক্রিয়া, শোকালাপের শারীরিক অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে পড়ে ওঠা যাবে না। তাই পয়গম্বরের নাতি ইমাম হোসেনের মৃত্যুকে শুধু সাহিত্যের ঘটনবস্তু বলে পড়ে উঠতে পারিনি। আরো ব্যাপ্ত কোনো আনুষ্ঠানিকতার, অনুষ্ঠানের রেপার্টোয়ারের, একটা অংশ ছিল তার কাহিনী। আলেখ্য হলে জঙ্গনামা, সংক্ষিপ্ত পদ হলে নওহা বা মর্সিয়া। বিষয় হল, কারবালার কাহিনী নিয়ে মর্মন্তুদ শোক প্রকাশের মাধ্যম এই সাহিত্যিক অভিব্যক্তিগুলি। মহরমের অঙ্গাঙ্গী অংশ। মহরমের প্রকাশভঙ্গীমা বুঝতে আমি পৌঁছলাম উত্তর ২৪ পরগণার ক্যাওশায়।

কারবালা থেকে ক্যাওশা

বাসরাস্তা দিয়ে তাজিয়াগুলি আসে, নানা গ্রাম থেকে মূল পীচের রাস্তায় এসে মেশে। গ্রামের পুরুষরা নওহা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুক চাপড়ে মাতম দিতে দিতে ছন্দে ছন্দে পা ফেলে এগোন। [৯] ক্যাওশা মোড়ে সেই কালো স্পন্দমান বুক চাপড়ের ছন্দে সমবেত ঢাকের মতো গর্জনরত কালো পোষাক পরা হাজার পুরুষের মিছিলগুলির মুখোমুখি পড়ে শারীরিক সংযোগের যে অনুভূতি তার ব্যাখ্যা দেওয়ার মতো তত্ত্ব আমার আয়ত্তে নেই। [১০] আর সেই পরিস্থিতি থেকে দু'রকমের মনোবৃত্তি আমার মধ্যে কাজ করতে থাকে। সন্ধানটি বিশ্লেষণী হয়

সন্দেহ নেই। কিন্তু, এতাবৎকাল তারই পড়োশি হয়ে থেকে তাকে সম্পূর্ণ অজানা করে রেখে দেওয়ার যে পাপবোধ ও অচেনার যে এক্সোটিকা, দুই'ই চলতে থাকে। কারণ, সত্যিই প্রাথমিক কৌতূহল ও না-জানা মহরম দৃশ্য দেখার উত্তেজনা, এছাড়া কোনো তাত্ত্বিক প্রশ্ন ছিল না, প্রথমে। তারপরই যা হতে থাকে তা যোগাযোগের সামান্যতম সূত্র খোঁজা। অতি কৌতূহলকে নিবৃত্ত করে চুপ করে শুনে যাওয়া দেখে যাওয়া। এথনোগ্রাফারের সেই আশংকাগুলি নিয়ে কথা বলতে গেলে এই গত তিনবছরের কথোপকথন, অভিব্যক্তির পুরো নক্‌শা তুলে পড়া প্রয়োজন যার সুযোগ এখানে নেই। সেটা অন্য আলোচনার অংশ হতে পারে। কিন্তু এটা অবশ্য বলবার যে ক্রমে কিছু সাক্ষাতের পর দুপুরে ডাল-আলুসেদ্ধ-লঙ্কাপোড়া দিয়ে ভাত খেয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ আসতে থাকে। পরের বছর দক্ষিণপাড়া ফিরে গেলে ফিরজা বলে, দিদি, তুমি আরো কেন আসো না। এই আশংকাতে, যোগাযোগের ও উপস্থাপনার রাজনীতিকে বুঝতে এই একটামাত্র সাবডিভিশানে বার বার ফিরে গেছি গত তিনবছর ধীরে ধীরে সম্পর্ক তৈরি করতে।

ক্যাওশায় ইমামবাড়ার দিকে যেতে বড় বাঁশ ও কালো কাপড়ের তোরণ। সমস্ত মিছিলগুলি তার নিচ দিয়ে গিয়ে একত্র হয় মাতম দিতে দিতে। দু'টি নওহার মাঝখানে ইয়া আলি/হায়দার এবং হায় হাসান/হায় হোসেন পুকার দিতে দিতে। মাইকে তখন উচ্চগ্রামে উর্দুতে বাজছে নওহা। ইমামবাড়ার পাশের একটা উঠোনে কিছু কিশোর বয়স্ক স্থানীয় ছেলে বক্সে সিডি চালাচ্ছে, যার ওপর লেখা আছে পাকিজা। মিসমি আব্বাস। নওহাখানের নাম জিজ্ঞেস করায় সমস্বরে বলে ওঠে ওরা। আর এই যে এত জোশের সঙ্গে মাতম দিতে দিতে আসছেন কালো শোকপোষাক সমস্ত পুরুষ, যাদের বিলাপের বুক চাপড়ানোর গতিজাড্য, আবেগের ভরবেগ এত স্বতঃস্ফূর্ত ও তুঙ্গ যে ইমামবাড়ার মাইক সবাইকে থেমে যেতে বলার পর ও ওঁদের সময় লাগে কমিয়ে আনতে তা, সরে যেতে পরের গ্রামের তাজিয়াসহ মিছিলকে জায়গা করে দিতে। এইখানে জানতে পারি, পাকিস্তানের মিসমি আব্বাস, নাদিম সারওয়ার, ইরফান হায়দার — এই নওহাখানদের সিডি-ডিভিডি এইসব অঞ্চলে এত জনপ্রিয় যে এই সময়, মহরম মাসের এক থেকে দশ, লাউড স্পিকারে বাজতে থাকে অহোরাত্র। এবং যে বাংলা নওহাগুলি পড়তে পড়তে এত মাতম, তা প্রায় সবক'টিই পাকিস্তানি উর্দু নওহার বাংলা অনুবাদ, সুরের চলনকে অক্ষুণ্ণ রেখে তা রেকর্ড করা হয়েছে, হ্যাঁ আসগর ভাইয়ের দোকানেই একমাত্র পাওয়া যায়।

একটু ভাবছিলাম। এই অঞ্চলে বাংলাই একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম (পুরো সাবডিভিশনে কুল্লে একটা ইংরিজি মাধ্যম হয়তো) আর প্রথাগত মাদ্রাসাগুলি, যেগুলি সরকারি রেজিস্ট্রিকৃত, যেগুলি সুন্নিভাবাপন্ন বলে শিয়ারা ততটা স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না সেখানে প্রাথমিক আরবি বা উর্দু শিক্ষা নিতে। শিয়াদের জন্য মূলতঃ সরকারি স্কুল, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক। দু'একটি যা হাতে গুনতি মাদ্রাসা, শিয়া ইমামবাড়া সংলগ্ন, রেজিস্টার্ড, তাতে প্রাপ্ত জ্ঞান দিয়ে এই পুরো পুরো ন "হা বোঝা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। অতএব, নিচে এই বিলাপরত বুকের ওপর করাঘাতে ঢাকের মতো গুম গুম সঙ্গত দেওয়াতে রত বাংলায় ইমাম হোসেনের প্রতি শোক উচ্ছ্বাস এর সময় ও স্থানিকতা মিলে যায় উপরে ডিসেম্বরের বাতাসে ভাসন্ত পাকিস্তানের উর্দু নওহার সঙ্গে। উর্দু নওহায় করাঘাতের সঙ্গে করা প্রবল শ্বাসাঘাত, তাও মিলে যায় নিচের প্রকৃত শরীরের থেকে উত্থিত প্রবল শ্বাসাঘাত শব্দে। এমনকী, উর্দুর অবাস্তবতা, এই খানাখন্দ, উজ্জ্বল সর্ষেক্ষেতে, পিচরাস্তার নিচেই কচুবনে, ফুলুরির দোকানে, ব্যান্ডেল টু হাসনাবাদ বাসরুটে, তেঁতুলিয়াগামী অজস্র অটোয় ট্রেকারে, রাস্তার পাশে দোকানের মাচায় — তা আস্তে আস্তে প্রশ্নের আকার নেয়। উর্দু ভাষাজ্ঞানের অভাব ও উর্দুভাষায় নওহা শোনার যে আকাঙ্ক্ষা, তার বৈপরীত্যে, তার সংযোগে-সংলাপে, অনুষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠানগুলি খুঁজে নিতে থাকি। এই যে পাকিস্তান থেকে, যেখানে শিয়া গোষ্ঠী সংখ্যালঘু, আমদানি হয়ে আসছে বম্বেতে। সেখান থেকে এই ধর্মীয় ভাবাবেগ, যার 'অ্যায় মেরে হুসেন অ্যায় মেরে ইমাম' ছাড়া আর কিছুই বোধগম্য না হয়েও তা প্রত্যন্ত স্থানিক অঞ্চলকে যুক্ত করে উদ্বুদ্ধ করে এক কল্পিত গোষ্ঠীচেতনায়, যার কোনো স্থানিক-কালিক ছেদ ভেদ নেই, অভিব্যক্তির স্থানিক তারতম্য থাকলেও। এইখানে দেখতে চাইছিলাম, কীভাবে নিউ মিডিয়ার মাধ্যমে তৈরি হওয়া এই কল্পিত গোষ্ঠী স্থানিক-আঞ্চলিক গোষ্ঠীর যৌথচেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়, ভক্তি ও ধর্মবোধের নতুন নতুন স্তর তৈরি করে। মৌখিক উচ্চারণরীতির ও শারীরিক অনুষ্ঠানের পার্থক্য ঘটে কি না কিছু।[১০]

মহিলাদের মজলিস

ইমামবাড়ায় পৌঁছে জেনেছিলাম, মহরমের এক তারিখ থেকে নয় তারিখ, প্রতিদিন বিকেলে বসে মহিলাদের মজলিস এবং ক্রমে যাতায়াতের ফলে সেই মজলিসগুলির গতি-প্রকৃতি জানা হয়েছিল ক্যাওশা দক্ষিণপাড়া, মির্জাপুর, বামনডাঙ্গা, মান্দ্রা — এইসব গ্রামে। ছোটো ছোটো ইমামবাড়ায়। মহিলা ও

পুরুষদের মজলিস সম্পূর্ণ আলাদা সময়ে হয়। মহিলারা মজলিস শেষে নজর বাঁটোয়ারা করে ইমামবাড়া ছেড়ে দিলে, সন্ধ্যায় শুরু হয় পুরুষদের মজলিস।[১১] স্বভাবতঃই পুরুষদের মজলিসে আমার প্রবেশাধিকার ছিল না, কিন্তু তাতে বাইরে কথা বলায়, কোন নওহা বেশি চলে, কোন নওহাখানই বা বেশি ভালো নওহা পড়েন — এসব আলোচনায় অসুবিধে হয়নি কিছু।

পুরুষদের মজলিস একটু বেশি আনুষ্ঠানিক, জাকের এসে আলোচনা করেন শিয়া ধর্মমতের মূল সূত্র,[১২] এক থেকে নয় তারিখ পড়া হয় উপস্থাপিত হয় কারবালা যুদ্ধের কাহিনী।[১৩] পর্যায়ক্রমে মহিলাদের মজলিসে, জেলায় বিশেষতঃ, জাকের থাকেন না কোনো বিশেষ পদমর্যাদা নিরিখে। কিন্তু, মহিলাদের মধ্যে কেউ ধরিয়ে দেন খেই, বুঝিয়ে দেন আজ কোন পর্ব থেকে নওহা পড়া হবে, আব্বাসকে উদ্ধারের জন্য ডাকা হতে পারে,[১৪] হতে পারে আলি আসগরের মৃত্যুর জন্য শোক,[১৫] অথবা কুফার সৈন্য যুদ্ধের পর অনাথ ও বিধবা সম্বলিত তাঁবুগুলি লুণ্ঠন করার তজ্জনিত অপমান ও অসহায়তা বোধ,[১৬] কারবালা থেকে উটের পিঠে চাপিয়ে পয়গম্বরের বাড়ির মেয়েদের ও একমাত্র জীবিত হোসেনপুত্র জয়নাল আবেদিনকে এজিদের কারাগারে প্রেরণ।[১৭] এই মহিলাদের অনেকেরই থাকে নওহা লেখা খাতা, খাতায় সাধারণত উর্দু থেকে বাংলা করা নওহাগুলি এবং অন্য উৎস হল মান্দ্রা গ্রামের বাবর আলি মাস্টারের লেখা প্রায় ৪০ বছর আগে ছাপা 'বাহাত্তর খুন' নামে একটি চটি বই, যার একমাত্র কপিটি আবিষ্কার করি মান্দ্রা গ্রামের হাজি আলেয়া বেগমের কাছে।[১৮] আর বাংলা নওহাগুলির কথা জিজ্ঞেস করতেই ক্যাওশায় বামনডাঙ্গায় মির্জাপুরে সমস্বরে লোকে বলে উঠেছিল, মিনু মিনু। কে মিনু? সলুয়ার বড়বাবুর ভাই। 'তিনিই এইসব উর্দু নওহা বাংলা করে, সুর দেয়, রেকর্ড করে। আমরা তার থেকে শিখি।'

তারপর জোগাড় করা মিনুর ডিভিডি-সিডি। সেই আসগর ভাইয়ের দোকান থেকেই। দেখা গেল, এই সমস্তই তাঁর কৃত এবং সলুয়ার ইমামবাড়াটিই উত্তর ২৪ পরগণার একটি অঞ্চলকে গ্লোবাল শিয়া গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ করার দায়িত্ব নিয়েছেন। মিনু হলেন সৈয়দ নাসির আলি জায়েদি, যাঁর দাদা সৈয়দ ইয়ুসুফ আলি জায়েদি সলুয়া ইমামবাড়ার মৌলানা। এঁরা মাটিয়াব্রুজের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন এবং পরিবারে বৌদের আনেন মুর্শিদাবাদ থেকে, বসার ঘরে ঢুকে তশরিফ লিজিয়ে শুনে ও নিজেদের মধ্যে উর্দুর বোলচাল করতে দেখে অবস্থানটা বুঝতে চেষ্টা করছিলাম।

গ্লোবাল ও লোকাল

নাসির সাহেবের অপূর্ব বিষাদাচ্ছন্ন নওহাগুলি পুরো জেলাতেই জনপ্রিয়। তিনি, ভিডিওতে দেখা যায়, পাঞ্জাবির ওপর কালো হাতকাটা জ্যাকেট পরে নওহাগুলি পড়েন, কিছু তাঁর অনুবাদ করা, কিছু তাঁর দাদার। বোঝাই যায় হোয়াইট ওয়াশ করা একটা ঘরে দাঁড়িয়ে নওহাগুলি পড়া। সঙ্গে ছন্দে, নিয়ম মেনেই চলতে থাকে বুকে করাঘাত, যা মুদ্রামাত্র। তাকে শব্দে পরিপূরণ করতে যেমন পাকিস্তানি নওহাগুলির সঙ্গে বাজে, এই খালি গলায় নওহা পড়ার সঙ্গেই অন্য ট্র্যাকে চলতে থাকে তীব্র ছন্দোবদ্ধ আক্ষেপভরা আঘাতদমকে চলতে থাকা শ্বাসাঘাত। নিচে, ডিভিডি শুরু হওয়ামাত্র, ভেসে উঠতে থাকে, হুসেইনী ক্যাসেট কালেকশান সেন্টার ও আসগর আলির ফোন নাম্বার। কী কী ধর্মীয় স্তোত্র পাওয়া যায় তার এক লাইনের বিবরণ ও বিজ্ঞাপন যে, রেকর্ডিংয়ে উৎসাহী ব্যক্তিরা যোগাযোগ করতে পারেন। গ্লোবাল পাঠনির্মিতির অভিক্ষেপে আঞ্চলিক ধর্মবোধ ও বাজারের এই মেলবন্ধন ধর্মীয়তাকে অন্য একটা রূপ দেয় নিশ্চয়ই যেখানে ক্রমে ইয়ুসুফ সাহেবের ছেলে জন মহম্মদ এবং ঢালীপাড়ার ইবনে আলি ও মিরাজ নিজস্ব সিডি করে ফেলেন, কিছু অঞ্চলের মানুষজন আর প্রায় পুরোনো নওহা মনেই করে উঠতে পারেন না।

নাসির সাহেবের নওহা পড়ার সঙ্গে পেছনে ভিস্যুয়াল যেতে থাকে। নানা জায়গার মহরমের অনুষ্ঠানের ভিডিও। টার্কি-গোয়ালিয়র থেকে বার্মিংহাম। 'হায় কারবালা' নওহাটিকে নানা ফর্মে — খাতার পাতায় হাতে লেখা থেকে শুরু করে তাজিয়া জুলুসে পুরুষদের মাতমে, ইমামবাড়ার পাশে সিমেন্টের বস্তা ঢাকা মেয়েদের মজলিসে, মাদ্রাসার ছাত্রের মোবাইল ফোনে, পেয়েছি। মেয়েদের মজলিসে পৌঁছতে পৌঁছতে সেটা হয়ে গেছে কারবেলা, কেন যে তা বুঝতে পারা যাবে না। কারণ, কারবালা শব্দটি জন্ম থেকে শ্রুত এবং পাশেই একটা মাঠ আছে তাজিয়া সমাগমের, তাকে 'কারবালা মাঠ' নামে ডাকা হয়। কী করে যে, এতদ্‌সত্ত্বেও, বাংলা নওহার সিডি থেকে কানে শ্রুত, খাতায় লিখিত ও ফের পঠিত হওয়ার মধ্যে, বিশেষত ক্যাওশার মহিলারা এই নওহাটি পাঠ করতে গিয়ে বদলে দেন যদিও দেখেছি তাঁদের খাতায় লেখা আছে কারবালা শব্দটিই। আবার, দেখি ইবনে আলি বাংলা নওহা পড়তে অবিকল নাদিম সারওয়ারের মতো ভঙ্গীগুলি করতে থাকেন রেকর্ডিংকালে। এবং তাঁর বাংলা অনুবাদের পরও উর্দু

নওহার 'কার্ব্ববালা' কারবালা হয় না। অন্যদিকে দেখি নাসির সাহেবের বহু প্রচল 'আলি মোর্তজা' নওহাটির (এটিও নাদিম সারওয়ারের মূল উর্দু নওহার অনুবাদ) শুরুতে ও মাঝখানে রয়েছে আলি সম্পর্কে মূল আরবিতে প্রশস্তি, মিছিলের পুরুষেরা ও মজলিসের মেয়েরা যা সহজেই খুব স্বতঃস্ফূর্ততায় বাদ দিয়ে অটুট বাংলায় একটা আখ্যান গড়ে নেন। খাতায় কি লেখা হয় ওই অংশটা খুঁজতে গিয়ে দেখি ডিভিডির নওহা বদলে বেশ ঘরোয়া উচ্চারণযোগ্য হয়ে উঠেছে। সেই আরবি শব্দ বা শব্দবন্ধই খাতায় লেখা দেখি থাকে যা তত দূরত্বের নয়, যেমন 'জুল্‌ম করে ইয়েজিদ ময়দান-এ-কারবালায়, হায় শাম, হায় শাম, হায় শাম'। শাম হল শাম-এ-গরিবা। [১৯]

কারবালা প্রান্তর থেকে যুদ্ধশেষে কুফার বাহিনী উটে চাপিয়ে নিয়ে যায় আহ্‌ল-উল-বয়েত (হজরত মহম্মদের বাড়ির/বংশের প্রসঙ্গে এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়)-এর নারী ও শিশুদের। কুফার বাজারে সর্বসমক্ষে তাঁদের অপমানের কাহিনীসূত্র নওহার এক অন্যতম প্রসঙ্গ তৈরি করে। পুরোনো নওহায় অনুপস্থিত এই ভাবটি। নতুন নওহায় নানা উপলক্ষ্যে এই অবমাননার চিত্র। তা সাধারণ বর্ণনার মত যেমন, 'হাত কড়ি বেড়ি পরা, যায় চলে যায়, জয়নাব সোগরা' বা কখনও মৃত বীরকে আহ্বান করে। আব্বাসের উদ্দেশ্যে একটি নওহা আছে, যাতে বলা হয়েছে, 'বিবিদের দুঃখ দেখে বুক ফেটে যায় বাবা, ইয়া আব্বাস, তুমি এসে দুঃখ দূর কর বাবা'। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে শাম আবার সিরিয়াও, যার রাজধানী দামেস্ক। ফলে শাম-এ গরিবা ছাড়াও অনেক সময় 'শামের বাজারে' এরকম পর্ব পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত এখানে এইসব চিহ্নগুলি সহ নওহা সংস্কৃতিকে দেখতে চেষ্টা করছিলাম। একটা পরিবর্তনের সূত্র হিসেবে। চেষ্টাটা যে খুব প্ল্যানপ্রসূত ছিল এমনটা নয়। ঘুরতে ঘুরতে চোখে পড়ছিল ইমামবড়ার পাশে খুঁটির ওপর টালির চালের দশ ফুট বাই দশ ফুট চারদিক খোলা মাটির মেঝের ইশকুল যাতে খুব এলিমেন্টারি স্তরে শিয়া ধর্মের গল্প শোনানো হয়, ইসলামের নিয়মকানুন অতি সহজ করে বোঝানো হয় ছয় থেকে নয়-দশ বছরের ছেলেমেয়েদের। নারকেলবেড়িয়া থেকে আসেন মাস্টারমশাই মহম্মদ জহির আলি, তরুণ বয়স্ক, যিনি পড়াশুনা করেছেন হুগলি ইমামবাড়ার মাদ্রাসায়। এই জাহিরভাই-ই নিজের পাড়ার ইমামবাড়াটিতে নিয়মিত করে তুলেছেন মেয়েদের নওহাপড়ার রীতি। তার আগে পড়েন হুগলীতে যে কাহিনী তিনি শিক্ষা করেছেন কারবালার ইতিহাস হিসেবে। লক্ষ করুন, মহিলাদের মজলিসে উপস্থিত থাকছেন পুরুষ এবং সম্ভবত

জাকের হিসেবেই পড়তে হবে তাঁর এই উপস্থিতি। ছোটো ছোটো প্রতিষ্ঠান, যা সামাজিক ও ধর্মীয় একাধারে, পবিত্র ও নিত্যদিনের, পূত অথচ বাজারি, তৈরি হচ্ছে। তার মধ্যে দিয়েই শিয়া সম্প্রদায়ের নতুন নির্মিতি ঘটছে এরকম একটা রূপরেখা চোখের সামনে দেখা যায়। এমনকী নওহাগুলির পাঠপ্রকরণ, বুনট, আখ্যানে কথকের স্বর এগুলি বিশ্লেষণ করলেও কিছু সমাজ বদলের সংকেত পড়ে ওঠা যেতে পারে।

ইমাম হোসেনের বোন জয়নাবকে এই বিলাপের মূল হোতা হিসেবে ধরা হয়। হোসেনের একমাত্র জীবিত পুত্র জয়নাল আবেদিনকে পরবর্তী ইমাম হিসেবে নির্বাচন করে তাকে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব নেন জয়নাব। [২০] কারবালার শোক প্রকাশিত হয় মূলত ক্রন্দনরত ইমামকন্যা সাকিনা, ইমামপত্নী সাহারবানুও কান্নায়, এই কান্না এমনকী 'বাহাত্তর খুন' বইতে প্রকাশ করা হয়েছে তোতাপাখির জবানিতে যে হানিফার দেশে উড়ে গিয়ে জানাবে যে জয়নাল আবেদিন সহ আহল-উল-বয়েত এজিদের কারাগারে বন্দি ('তোতাপাখি বলে, ও বাদশা নামদার এনেছি এ খবর/ তোমার জয়নাল আবেদিন বাদশাই পেয়েছে কারাগারের ভিতর)। এই বাদশাই হল ইমামদারি যা জয়নালকে তার বৈধ উত্তরাধিকার হিসেবে মনে করায় জয়নাব, তার পিসি।

এটি শিয়া সম্প্রদায়ের আত্মতানির্মাণের একটি বিশেষ মুহূর্ত যেখানে ইমাম হোসেনের পরে কে হবেন ইমাম এবং তারপর পর পর ইমামরা মিলে বারো ইমামের নেতৃত্বে গঠন হবে ইথনা আশারি শিয়া গোষ্ঠী। কিন্তু, সম্প্রদায় গঠনের জন্য এই বিশেষ মুহূর্তটিকে খুব একটা পাওয়া যায় না প্রচলিত মুখে মুখে প্রবাহিত নওহাগুলিতে। সেখানে কারবালা যুদ্ধকাহিনীর বিলাপই মুখ্য।

কিন্তু, সম্ভবতঃ, কারবালা কাহিনীকে তার সম্পূর্ণ ঘটনা পরম্পরায় দেখে, গোটা আখ্যানের মতো বুঝতে চাওয়ার যে সাম্প্রতিক প্রয়াস, সেইখান থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে জয়নাব, জয়নাল আবেদিন এই চরিত্রগুলি ক্রমে মুখ্য হয়ে উঠছে। যাঁরা প্রচলিত বিলাপকারী কারিণী, তাঁদের সঙ্গে বিলাপ করতে শুরু করছেন ইমাম হোসেন নিজে, এমনকী বিলাপ করছে শিশুপুত্র আসগর। [২১] অর্থাৎ মৃতের কণ্ঠ পর্যন্ত এইবার বিলাপে রত হওয়ায় শোকের অভিমুখ বদলে যাচ্ছে। যদি মৃত বীরের মাতা-ভগিনী-কন্যা কাঁদেন, তাহলে তা প্রিয়বিয়োগের শোক হয়। কিন্তু, নতুন নওহাগুলির ইমাম হোসেন যখন কাঁদেন, তখন তা অলঙ্ঘনীয় মৃত্যুর থেকে ভয় থাকে না শুধু, একটি গোষ্ঠীকে বেসাহারা ছেড়ে যাওয়ার যে ভীতি, তাও

অবশ্যম্ভাবী থাকে সেই বিলাপে যা নারীর বিলাপে অনুপস্থিত। তবে, লক্ষ করলে দেখা যায় নারীর বিলাপের ধরণও বদলাচ্ছে। আর এই পুরোটাই হতে থাকবে নতুন মাধ্যম — পাইরেটেড সিডি ডিভিডি'র সঙ্গে স্থানীয় রীতিগুলির ও স্থানীয় চাহিদার আদান-প্রদানে। চাহিদা তো তৈরিও হয়। বিলাপ-এর ঘরানায় জোশ এসে মেলে। মির্জাপুর গ্রামের আরজিনা বিবি জানান, তাঁর উঠোনে কেটে আনা সর্ষে ঝাড়ের শুকনো মাথা ঝিমঝিমে গন্ধের মধ্যে বসে মাথা নাড়িয়ে বলেন, আগে খুব কষ্ট থাকত সুরে, এখন জোশ বেশি। কথাটা ওর সামনেই খাতা খুলে লিখলাম দেখে বলেই আবার বলেন, কাইট্যে দেন, ধর্মের জিনিস তো। উনি এখন বলতে এই ডিভিডি সিডি জাত নওহাগুলি এবং তার অনুবাদের কথা বলছিলেন। সোজাসাপটা বিলাপের বাইরে, হৃতসর্বস্বতার বাইরে (হৃতসর্বস্বতার ক্রন্দনময় অভিব্যক্তি ছাড়াও) তার একধরনের কথা/বয়ান তৈরি হচ্ছে। তার উচ্চারণ যদিও নওহামাফিক। কিন্তু বাচ্য ভিন্ন, তা কারবালাকে জীবনচর্যায় কেন্দ্রে রেখে ইসলামকে ধারণ করতে চায়। যেমন, এই বাংলা নওহাটিতে,

কারবালা বাঁচালো ইসলাম
ইসলামের নামাজ রোজা হজকে যে বাঁচিয়েছে
ভুলে গেছে দুনিয়া তার নাম
আজ তাকে জানাই মোরা সেলাম।

বিলাপের বাইরে, বিলাপ-সহই এখন একটা গোষ্ঠীর ধারণা যা যেমন একাধারে বহন করে ভিকটিমহুডের উপলব্ধি, তেমনি একটা প্রতি-বয়ানও। যা বিলাপের মধ্যে দিয়েই সাধিত হবে। এ স্পষ্টত 'বাহাত্তর খুন'-এর বিলাপ প্রকৃতি থেকে আলাদা —

হায় আল্লা কী হল
আকবর কেন ছেড়ে গেল [২২]
আমার আশা না মিটিল
ওগো ফতেমা জননী তোমার ভরা তরীখানি
আজ কারবালায় বুরি হল
নূরের চেহেরা আকবর ছবি যেন মুস্তাফার [২৩]
কারবালায় মিটে গেল
আকবরের লাশ লয়ে কান্দে বানু কাতর হয়ে [২৪]

(বলে) একবার আমায় মা বলো
মা বলে বাপ গেল রণে আর না মা বলিলে
আমার মানিক রতন।

এই সরাসরি হার্দিক বিলাপ সহই 'বাহাত্তর খুন' বইটিতে থাকে সম্প্রদায়ের স্পষ্ট ধারণা। কিন্তু, তুলনা করলেই একটা স্পষ্ট প্রয়াস দেখা যায় ১৯৮০ থেকে প্রাপ্ত ডিজিটাইজড নওহাগুলির আগমনের পর থেকে যার মাত্রা আগেকার উচ্চারণগুলি থেকে আলাদা।

দাস্ত কারবালায়, ফোরাত কিনারায়, হোসেন শহীদ রসুলের পেয়ারা।
আখেরি নবি মোহাম্মদ মোস্তফা, তাহারি পিয়ারা কলিজা টুকরা।
লা এলা হা ইলাল্লা কালেমা পড়িয়া, তাহার নাতিকে দিল জবাই করিয়া, হায় রে দুনিয়া কী হল বিচার, তারা কি মুখ দেখাবে মোস্তফার ... যে নবীর কলেমায় হলি মুসলমান, তাহারি আওলাদে কাটিলি গর্দানে, রসুলের উম্মত হয়ে তোমরা রসুলের কলিজায়ে মারলে ছোরা ...' [২৫]

এখান থেকে আলাদা হয়ে যায়, নিউ মিডিয়া উচ্চারণগুলি আলাদা হয়ে যায়,

'আজ শাম-এ-গরিবার রাতে/জয়নাব বলে কেঁদে কেঁদে/দ্যাখো এ যে কারবালাতে বেকাফনে হুসেন তপ্ত মাটির পরে/ নানা দেখো পড়ে আছে নাতি তোমার/ যারা তোমার কলেমা পড়ে সুন্নত আদায় করে/ তারাই মারল হুসেনকে তোমার উম্মত হয়ে/ তোমার নামাজ রোজা হজ্জকে বাঁচাতে গিয়ে/ দিয়ে দিয়েছে সব-ই তোমার দ্বীনকে বাঁচাতে গিয়ে/ ভরা ঘর বিরান হোল ...'

যেমন, বিলাপ ঘরানার নানা অভিব্যক্তিতে এই নবতর উপলব্ধি যেমন প্রকাশ পাচ্ছে, তেমনি তৈরি হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক ধর্মীয় বাচনিক একটি ক্ষেত্র। নতুন বাংলা (অনূদিত/অনুকৃত) নওহার খানিকটা অংশ সেই উচ্চারণ, নতুন ধর্মীয়-সামাজিকতা।

শোনো আজাদারো [২৬]
আমির-এ-বয়ান শোনো
আমার আওয়াজে সকলে আওয়াজ মিলিয়ে বল
শোনো আজাদারো
আব্বাসের আলম ধরো [২৭]
মাতম মজলিস কর

উদ্দেশ্য হজরত-এ-হুসেনের দুনিয়াকে বলিব
জিও হুসেনিও
আমরা যেখানে যাবো কাজাখানা আজাবো
কারবালা মনে করিব
কারবালা জীবনের উদ্দেশ্য বলে দিয়েছে
কারাবালা জুলুমের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছে
আমরা যেখানে যাব হকের[২৮] প্রদীপ জ্বালাবো
কারবালার কথা বলিব
কারবালা মোমিন পর্দা বলে দিয়েছে
কারবালাতে সকিনা পর্দা পরা শিখিয়েছে
ছিল না চাদর যখন চুল দিয়ে পর্দা করেছে
আমরা যেখানে যাব পর্দার কথা বলিব
কারবালার কথা বলিব
জিও হুসেনিয় ...

হতে পারে এ হল গ্লোবালাইজেশানের মুহূর্তে সাধারণ মানুষের সাধারণ ভক্তিকে একটু গ্রন্থীবদ্ধ করার প্রয়াস, উম্মতকে বোঝার ও পুনর্নির্মাণ করার অভিপ্রায়। যেমন, তাৎক্ষণিকভাবে নওহাপড়ার পরম্পরাকে ছাড়িয়ে রীতিটি হয়ে উঠছে অভ্যাস করা, রিহার্সাল দেওয়ার মধ্যে দিয়ে সচেতন সামাজিকের একটি অঙ্গ।

এই সামাজিকের সঙ্গেই হেঁটে চলেছি। রাত হয়ে গেলে ঘরের একমাত্র খাটটিতে ঘুমোনোর জায়গা করে দিতে চেয়েছেন কেউ, দুপুরে খাওয়ার সময় হয়ে গেলে নিজেরই ভাগের ভাত আর কুচো মাছের ঝোল ধরে দিতে চেয়েছেন সাগ্রহে। কেউ সঙ্গে করে হেঁটে নিয়ে গেছেন পরের গ্রামে, স্কুলে যাওয়ার পথে কোনো স্কুলছাত্রী দিয়েছে লিফট, তার ছোটো সাইকেলে। এসবের মধ্যে তাদের ধর্মাচরণ, যা সামাজিক জীবনযাপনই, তা নিয়ে বিশ্লেষণ করতে দ্বিধা হয়। মনে হয় শুধু বর্ণনা করে যাই এই মেলা-মেশার সংরূপ যেখানে কিছুক্ষণ পর বিলাপের খেদোক্তিতে হাত থেকে নামিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে ক্যামেরা, সরিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে খাতা-পেন। লিখি যে, সেই প্রিয় মেরে ইমাম, যার কল্পনাই আমার মধ্যে নেই, শুধু চেতনা আছে, যোগাযোগ আছে, তার নামের প্রতিটি মজলিসে উঠে দাঁড়িয়ে বুক চাপড়ে আমার রেখে আসতে ইচ্ছে করেছে শোকের অংশীদারিত্ব। তারপরে, প্রতিবারই, ফিরে আসার পথে ফিরে আসে পরিপ্রেক্ষিত, দূরত্বের বোধ,

একটি সমাজের প্রবহমানতাকে বুঝবার প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণী তত্ত্বমূলগুলি। এই দোটানা চলতেই থাকে।

সূত্র নির্দেশ

১। তাজিয়া — ইরানের একটি থিয়েটার শৈলী যে শৈলীতে কারবালার যুদ্ধে হজরত মহম্মদের দৌহিত্র ইমাম হোসেনের শহীদ হওয়ার মর্মন্তুদ কাহিনী অভিনীত হয়। পশ্চিমবঙ্গে বা বাংলাদেশে অবশ্য সুসজ্জিত যে কফিন কাঁধে বয়ে মহরমের মিছিল বেরোয়, সেই কফিনকে তাজিয়া বলে। তাবুত তো বলেই কফিনকে।

২। শিয়া — এই রাষ্ট্রের অন্যতম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী। সমগ্র মুসলিম সমাজের প্রেক্ষিতেই শিয়ারা সংখ্যালঘু। শিয়া কথাটি এসেছে শিয়াত আলি থেকে, অর্থাৎ আলির দল বা গোষ্ঠী। রসুল হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর ইসলামের নেতৃত্ব নির্ধারণ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। একদল চান পবিত্র রক্তের সম্পর্কের উত্তরাধিকার। অর্থাৎ, হজরত মহম্মদের পর ইমাম হবেন তাঁর জামাতা আলি, যিনি ফতেমার স্বামী এবং মহম্মদের চার প্রধান অনুগামীদের একজন। অন্য একটি মত ছিল যে, না, পরবর্তী ইমাম হবেন নির্বাচনের মাধ্যমে গণসম্মতিক্রমে। এই গণ অবশ্যই নির্বাচিত গণ। এই গণের চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তী ইমাম হন আবু বকর ও তারপরে ক্রমসারণীতে উমর ও উসমান। উসমানের মৃত্যুর পর চতুর্থ ইমাম হন আলি। যাঁরা শিয়া, তারা প্রথম তিনজন ইমামকে অস্বীকার করে ইমামতি শুনতে শুরু করে আলি থেকে। যারা গণনির্বাচনের কথা বলেছিলেন তাঁরাই সুন্নি।

৩। নওহা — মর্সিয়ার মতোই একটি সংরূপ হল নওহা। মর্সিয়া, মৃত্যুজনিত শোক গাথা, আলির পুত্র ইমাম হাসান ও হোসেনের মৃত্যুর পর এক বিশেষ চেহারা নেয়। বিশেষতঃ কারবালার অসম যুদ্ধে ইমাম হোসেনের মৃত্যুর পর, সেই শোকের প্রতিবছর পুনরাবৃত্তির অন্যতম অভিব্যক্তি হল মর্সিয়া এবং নওহা। ব্যাকরণ মেনে বলতে গেলে নওহা মর্সিয়ারই একটি উপ-ভাগ, যার উৎস আরবি। পারসিক ঐতিহ্যে আত্মপ্রকাশ অতঃপর। উর্দু নওহা ও মর্সিয়া এক বিরাট সাহিত্যভাগ।

৪। নঅা — উত্তর ২৪ পরগণার বাংলায় নওহা/নোহা যেভাবে উচ্চারণ করা হয়।

৫। মহরমের মাসের ১০ তারিখ হল আশুরা। এই দিনটি মহরম-এর শোক উদ্‌যাপনের তুঙ্গ মুহূর্ত, কেননা কারবালার প্রাঙ্গনে ইমাম হোসেনের শাহাদাৎ ওই তারিখেই হয়েছিল। মহরম মাসের এক তারিখ থেকে শুরু হয় শোকপালন। নারীরা অলঙ্কার-প্রসাধন বর্জন করেন, সর্বদা কালো পোষাক পরে উপোস রাখেন। প্রতিদিনই ধর্মীয় উপদেশ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে হয় বিলাপের পর্ব, মর্সিয়া পঠন ও নওহা পঠনের মধ্যে দিয়ে। নারী ও পুরুষেরা আলাদা আলাদা পড়েন। শেষে, ১০ তারিখে তাজিয়া মিছিলসহ এই শোক বেরিয়ে পড়ে পথে, বুকে চাপড় মারতে মারতে, কখনও চাকু বা শৃঙ্খল দিয়ে পিঠে আঘাত করে শোকের চিহ্ন হিসেবে রক্তপাতও ঘটানো হয়।

৬। নওহা, গান নয়। অতএব সেই ধর্মীয় পবিত্রতা বোঝাতে নওহা গাওয়া এভাবে বলা যাবে না, বলতে হবে নওহা পড়া। কাজের শুরুতে এই ভাষা ব্যবহার ওঁরাই শুধরে দিয়েছিলেন।

৭। চার্লস হিরশকাইন্ড, দ্য এথিকাল সাউন্ডস্কেপ ক্যাসেট সারমনস অ্যান্ড ইসলামিক কাউন্টার পাবলিকস, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৬।

৮। আলি ইমাম হওয়ার সময়েই পূর্ববর্তী খালিফা-ইমাম উসমানের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন মুয়থাবিয়া, দামেস্ক-এ। আলি গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হওয়ার পর ইমাম হন তাঁর পুত্র হাসান। কিন্তু ততক্ষণে মুয়থাবিয়া পুত্র ইয়েজিদ যথেষ্ট উচ্চাকাঙ্খী হয়ে উঠেছে সমগ্র ইসলামিক রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হাতে নেওয়ার জন্য। বশ্যতা স্বীকার না করায় ইয়েজিদ হাসানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে কর্তৃত্ব হাতে রাখতে চেয়ে। ছোটো ভাই ইমাম সহ হোসেন কুফা অধিপতির সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে পরিবারবর্গ ও ছোটো একটি সৈন্যদল নিয়ে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথে, ফোরাত নদীর কিনারায় কারাবালা প্রান্তরে ইয়েজিদের নির্দেশমতো কুফা অধিপতি জিয়াদের বাহিনী ফোরাত নদীর ধারা বন্ধ করে জলকষ্টে অত্যাচার করে। অসম যুদ্ধে হোসেন হোসেনের পক্ষের সমস্ত বীরকে হত্যা করে এবং নারী ও শিশুদের নিয়ে যায় দামেস্কে, ইয়েজিদের দরবারে। এই ঘটনায় ইসলাম সমাজে প্রথম, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভেদটি ঘটে, সুন্নি-শিয়াতে ভেঙে যায় ধর্মীয়তা। কারবালা যুদ্ধ হয় ৬৮০ অব্দে।

৯। ইমাম হোসেন ও তাঁর সঙ্গীদের মৃত্যুর পর শোকপালনের যে প্রথা তা কারবালা যুদ্ধের পরপরই শুরু হয়। শিয়া ঐতিহাসিকরা বলেন, ইমাম হোসেনের বোন জয়নারের নেতৃত্বে এই শারীরিকতায়, অর্থাৎ বুক চাপড়ে ও মাথার চুল খুলে, শুরু হয় মাতম।

১০। সম্ভবতঃ ছাপা বই গোষ্ঠীধারণায় সম্ভাব্য 'বিপ্লব' আনতে পারেনি এই মৌখিকতানির্ভর গোষ্ঠীগুলিতে। অবশ্যই মৌখিকতা নির্ভরতা বলতে আমি নিরক্ষরতা বোঝাতে চাইছি না, বোঝাতে চাইছি একধরনের ধর্মীয় যৌক্তিকতা ও যৌথতা যা ছাপাখানা সাধারণতঃ ভেঙে দেয়। পুনর্নির্মাণ করে। এই পুনর্নির্মাণ সম্ভবতঃ সম্ভবপর হচ্ছে এতদিনে, গ্লোবালাইজেশনের ফলস্বরূপ নিউ মিডিয়া, ইন্টারনেট কানেকশান ও ডিজিটাল মাধ্যম এক মুহূর্তে যোগ করছে পাঠ উৎপাদন ও পাঠ-উপভোগের কেন্দ্রগুলিকে। আপাতভাবে যেন, স্থানিক অবস্থান অতিরেকী একটি নেটওয়ার্কের সম্ভাবনা ঘটছে। যেন, স্থিত রাষ্ট্র ভাবনার বাইরে নিউ মিডিয়া তার ক্রমপ্রসারণক্ষম ডিজিটাল টেক্সগুলির মধ্য দিয়ে অন্য একটি সমাজগঠনের সম্ভাবনা তৈরি করেছে। কথা বলে জানতে পারি এই ঘটনাটি শুরু হয়েছে গত বছর দশের আগে।

১১। নজর। প্রণামী বা প্রসাদের মত। এটা বিশেষ করে মহিলাদের মজলিস-মাতমের অঙ্গ। উপাচার নিয়ে এসে একত্র করে রেখে ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি সারবার পর নজর সমানভাবে উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। শিশুরাও উপস্থিত থাকে।

১২। জাকের, যিনি ধর্ম উপদেশমূলক অনুষ্ঠানের মূল বক্তা। কথাটি এসেছে জিকর অর্থাৎ ঈশ্বরের নাম সরবে ঘোষণা হোক।

১৩। এক থেকে নয় তারিখ, প্রতিদিন ভাগ করে নেওয়া হয়েছে কারবালার ঘটনার এপিসোডগুলি।

১৪। আব্বাস হলেন আলির পুত্র। ইমাম হাসান ইমাম হোসেনের সৎ-ভাই, কারবালা যুদ্ধে হোসেনের সঙ্গী। হোসেন কন্যা সাকিনা যখন তৃষ্ণায় কাতর হয়ে চল চান, আব্বাস মশক ভরে জল নিয়ে আসেন শত্রুবেষ্টনী থেকে। এ সময়ই শত্রুরা তাঁর জলবাহিত দুই হাত কেটে ফেলে। ইনি, শোকপালনের শহিদদের মধ্যে অন্যতম স্তম্ভ। ইনিই বহন করতেন ইমাম পরিবারের মূল আলম, মানে পতাকা। সেটি হজরত মহম্মদের পতাকা।

১৫। আলি আসগর ইমাম হোসেনের শিশুপুত্র। তার তৃষ্ণা দেখতে না পেরে হোসেনপত্নী সাহারবানু হোসেনের কাছে দেন তাকে জল খাইয়ে আনতে। শিশুপুত্রকে বুকে নিয়ে ইমাম ফোরেত নদীর কূলে এলে শত্রুপক্ষ হোসেনকে লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়ে যা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আলি আসগরের বুকে বিদ্ধ হয়। এই ঘটনাটি জন্ম দিয়েছে প্রভূত শোকের ও তৎসংলগ্ন নওহা-মর্সিয়ার।

১৬। যুদ্ধের পর কুফাবাহিনী আহল-উল-বায়েতের তাঁবু (খিমা) লুণ্ঠন করে। এইসময় কোনো এক সেনা হোসেনপুত্রী সাকিনার কানের দুল ছিঁড়ে নেয়। এই রক্তপাতের কাহিনী অত্যন্ত কলঙ্কজনক ও ইসলামবিরোধী বলে শিয়া ইতিহাসে লিখিত, কারণ এ রক্ত তো আসলে হজরত মহম্মদের।

১৭। জয়নাল আবেদিনকে এজিদের কারাগারে প্রেরণ। এই অধ্যায়টি বিলাপের সূত্র হিসেবে বহুল প্রচলিত। জয়নাব, হুসেনের বোন, জয়নাল আবেদিনকে পরবর্তী ইমাম নির্বাচিত করে এরপর জনসমক্ষে বক্তৃতা দেন। এখান থেকে শুরু হয় শিয়া গোষ্ঠীর আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপ।

১৮। মান্দ্রা গ্রামটিতে যে পরিবারটি ইমামবাড়ার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের কাছ থেকে জানতে পারা যায় উত্তর ২৪ পরগণার শিয়া গোষ্ঠীর উৎপত্তির অন্য ইতিহাস। অন্য বলতে সলুয়ার ইমামবাড়ির মৌলানারা যা বলে থাকেন, তার থেকে ভিন্ন। এবং সমস্ত উত্তর ২৪ পরগণায় অনূদিত বাংলা নওহার প্রচলন থাকলেও, মান্দ্রা অঞ্চলটিতে ছোটো একটি অংশে পুরোনো নওহার চলই বেশি।

১৯। শাম-এ-গরিবার হল আশুরার পরের দিন। বিবি জয়নাব ও উম্মে কুলসুম সকিনাকে খুঁজে পান হুসেনের মৃতদেহের পাশে। বিবি সকিনা বাবাকে বলেছিলেন তাদের দুর্দশার কথা। এই ভাষ্যটিও মর্সিয়া-নওহার জগতে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

২০। বিবি জয়নাব যখন জয়নাল আবেদিনকে পরবর্তী ইমাম ঘোষণা করেন, সেই মুহূর্তটিকে শিয়া সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রথম সূত্র বলে ভাবা হয়। এরপর আলির অপর পুত্র, বিবি হানুফার সন্তান হানিফাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় আহল-উল-বয়েতের সম্মান পুনরুদ্ধারে। তখন হানিফা কী করেন তার ওপরে অজস্র কিস্‌সা/কেচ্ছাসাহিত্য আছে।

২১। ক্রমে হুসেনের গলায় বিলাপের ধ্বনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং অনেক সময় তা যোগ্য বীর আলি আকবরের প্রতি জেগে উঠে গোষ্ঠীর হাত ধরার ডাকে প্রকাশ পায়। 'ওঠো আকবর, বাবা ডাকে'। শিশুপুত্র মৃত আসগর মা ও দিদির পর্দা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ছিল তার, একথা বলে।

২২। আকবর আজান দিতে কারবালা প্রাঙ্গণ শোকাকুল হয় কেননা, সকলে জানে এই-ই তার শেষ আজানের ডাক। আকবর হুসেন ও বিবি লায়লার পুত্র। ভাবা হয়, তাঁকে দেখতে অবিকল হজরত মহম্মদের মতো।

২৩। পরগম্বর কেন্দ্রিক যে ভক্তি, তাতে তাঁকে নূর, জ্যোতিঃপুঞ্জ, হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। যেন, আকবরও ধারণ করে আছে সেই নূর।

২৪। বানু হলেন সাহাববানু। আকবরের মা।

২৫। উম্মত। অত্যন্ত জটিল ও স্তরবিন্যস্ত এই ধারণাটির সাধারণ অর্থ হল গোষ্ঠী। সম্প্রদায়ভিত্তিক যৌথত। নবির উম্মত, মানে, নবির গোষ্ঠী।

২৬। আজাদারো, আজাদার-এর বহুবচন। শোকপালনকারী। শিয়া অর্থে মাতম-মজলিস করে শোকপালন।

২৭। আলম হল পতাকা। শিয়ারা যে পতাকা বয়ে নেন তার ওপরে থাকে পাক পঞ্জতন। হাতের পাঁচটি আঙ্গুল আসলে প্রতীক পাঁচ ব্যক্তিত্বের — পরগম্বর, ফতিমা, আলি, ইমাম হাসান ও হোসেন।

২৮। সত্য।

ঈপ্সিতা হালদার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য পড়ান।

গোলঘর। বীরভূমে সিউড়ির কাছে নিতাই-এর মাটির বাড়ি।
সূত্র : বয়ান। www.bayaan.in

কোথায় রেকর্ড করব

সুকান্ত মজুমদার

'হিমঘরে' গান

আমাদের কিছু পরিচিত-জন, বন্ধু-বান্ধব মিলে, বছর কয়েক আগে ঠিক করলেন নিজেদের গান নিজেরাই রেকর্ড করে বিক্রি করবেন। কলকাতার সাউন্ড স্টুডিওতে রেকর্ড হবে ঠিক হল। পরপর দু'রাত্তির রেকর্ডিং। রেকর্ড করতে গিয়ে দেখলাম কারোরই গান গাইবার সেই জোশ আর নেই। এই শিল্পীরাই কিন্তু রাতের পর রাত জেগে গান গাইতে অভ্যস্ত। তাহলে এখানে এইভাবে ঝিমিয়ে পড়ার কারণ কী? দর্শক, আলো, শব্দ প্রক্ষেপণ — সব মিলিয়ে স্টেজের যে জৌলুস, তা না থাকা একটা কারণ হতে পারে। আর এই ঠাণ্ডা নিথর ঘর, চারপাশের কোনও শব্দ আসে না, নানা যন্ত্রপাতির সমাবেশ, নিস্তেজ আলো — এখানে একটা ভয়-ভয়, শ্রদ্ধা-শ্রদ্ধা ভাব জাগে বটে, কিন্তু সে ভাবে কি আর গান হয়! আমরা বারবার বিড়ি ও আনুষঙ্গিক নানা ব্রেক নিতে থাকি, কিন্তু গান আর এগোয় না। এদিকে ঘন্টায় ঘন্টায় টাকা উঠছে, তার একটা চাপ আছে। একটা অ্যালবাম তৈরি করার মতো খান আট-দশ গান দু'দিনে রেকর্ড করতে বেশ বেগ পেতে হয়। অ্যালবাম হয়তো বেরিয়ে যায় কোনোমতে, তবে সে গানে দেখা যায় তেমন প্রাণ নেই। এই প্রাণ না থাকার ব্যাপারটা কি শুধুমাত্র শিল্পীদের জন্য? এই রাতের আবেশে, ঠাণ্ডা ঘরে, স্তিমিত ভাবে গান গাইবার ফলে কি এইরকম শুনতে লাগছে রেকর্ডিংটা?

উত্তরের খোঁজে প্রথমে ঢোকা যাক রেকর্ডিং-এর ঘরটিতে; এই ঘরের চেহারাটা একবার দেখে নেওয়া যাক।

বেশ ভারী মোটা একটা দরজা টেনে খুললে দেখা যায়, আর একটা ভারী মোটা দরজা। সেটা ঠেললে তবে ঘরে ঢোকা যায়। ঘরটার দেয়ালগুলো ঠিক

আমাদের পরিচিত প্রতিদিন-দেখা ঘরের দেয়ালের মতো সিমেন্টের পলেস্তারার উপর চুনকাম করা বা রঙ করা নয়। দেয়ালের গায়ে কিসের সব আস্তরণ পরানো। টিপেটুপে দেখলে নরম-নরম লাগে। মনে হয় তোষকের মতো নরম কিছু দেয়ালে সেঁটে দেওয়া হয়েছে যেন। আর একটু ভালো করে দেখলে দেখা যায় ঘরটা ঠিক চৌকো বা আয়তাকার নয়। একবার দেখলে ঠাহর না হতে পারে, তবে ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যায়, একটা দেয়াল তার মুখোমুখি উল্টো দিকের দেয়ালের সঙ্গে ঠিক সমান্তরাল নয়। কায়দা করে মুখোমুখি সমস্ত সমান্তরালতা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। দেয়ালের গায়ে হয়ত কাঠের একটা চৌকো বাক্স-মতো বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে —

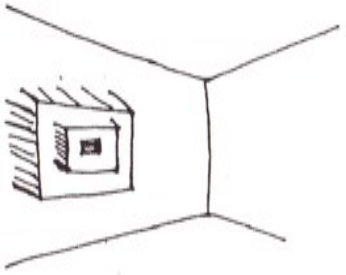

অথবা দেয়ালটা এইভাবে তৈরি করা হয়েছে —

মোদ্দা কথা, দেয়ালের সরলরৈখিক জ্যামিতিটাকে নানাভাবে ভেঙে উঁচুনিচু করে ফেলা হয়েছে। ছাতেও আসল কংক্রিটের নীচে আর একটা উঁচুনিচু নকল ছাত বসানো হয়েছে কাঠের ফ্রেমের সাহায্যে। এমনকি যে কাচ বসানো

জানলাটার মধ্য দিয়ে পাশের লাগোয়া ঘরটায় শব্দযন্ত্রীকে দেখা যাচ্ছে নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে আছেন, সেই জানলার কাচও একটু বাঁকা করে বসানো। মেঝেটাও খালি নেই, মোটা কার্পেট দিয়ে ঢাকা। আমরা খালি চোখে ধরতে পারছি না, তবে এই মেঝেটাও আসল কংক্রিটের মেঝের উপর কাঠের ফ্রেম বানিয়ে, তার উপর প্লাইউডের তক্তা বসিয়ে, একটা মেঝে-জোড়া তক্তাপোষ বানিয়ে, তার উপরে কার্পেট ঢাকা দিয়ে তৈরি করা। দেয়ালের গায়ে নরম নরম আস্তরণ তো আগেই দেখেছি, কোনো কোনো রেকর্ডিং স্টুডিওতে আবার দেখা যায় দেয়ালের গায়ে ফুটো ফুটো কাঠ-জাতীয় কিছুর বোর্ড বসানো। অথবা সাদা টাইলসের মতো জিনিস বসানো, যেগুলো একেবারেই সাধারণ টাইলসের মতো চকচকে নয় এবং এগুলোও ঐ বোর্ডের মতোই ফুটো ফুটো।

এই ঘরটার আর একটা বৈশিষ্ট্যও নজর করার মতো। ঘরটা ফাঁকা। একটাও আসবাব নেই। বড়ো জোর দু'একটা চেয়ার পাতা, বা একটা টেবিল — এই ধরনের জিনিস। না, এই খালি-খালি ব্যাপারটা বৈশিষ্ট্য নয়। বৈশিষ্ট্য হল, আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার খালি-খালি ঘরগুলোর থেকে এই খালি ঘরের শাব্দিক চেহারাটা আলাদা। আমরা একটা আসবাবহীন ফাঁকা ঘরের কথা বললে শব্দ যেমন গমগম করে ওঠে, এখানে তেমনটা হচ্ছে না। এই ব্যাপারটা খেয়াল করলে খানিকটা যেন বোঝা যায়, কেন এই ঘরটা জুড়ে এত কাণ্ড করা হয়েছে। তার মানে যেখানে রেকর্ড করব সেখানে শব্দের গমগমে ভাবটা থাকলে চলবে না।

গমগমে ভাবটা কি অসুবিধা করে সেটা আমরা সকলেই বিভিন্ন সময়ে নিশ্চয়ই অল্পবিস্তর উপলব্ধি করেছি। খুব চলতি উদাহরণ হল, বড়ো খালি হলঘর। যেখানে সভা হলে বা কোনো ক্লাস হলে বক্তার কথা ভালো করে বোঝা যায় না। এমন নয় যে সেখানে বাইরে থেকে অনেক শব্দ এসে ঢেকে দিচ্ছে বক্তার কথা। বড়োজোর কয়েকটা সিলিং ফ্যান মাথার উপর শব্দ করে ঘুরছে। সেই শব্দে গলার আওয়াজ চাপা পড়ে যাবার কথা নয়। এখানে বক্তার গলার আওয়াজই সেই আওয়াজ শোনার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে, শব্দ-শক্তির নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্যের জন্য। সেই বৈশিষ্ট্য হল প্রতিফলন। শব্দ উৎস থেকে বেরোনোর পর শক্ত দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে, আবার ধাক্কা খায়, ফিরে আসে — এই চলতে থাকে যতক্ষণ না তা ধাক্কাধাক্কিতে সব শক্তি হারিয়ে একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। শব্দ-শক্তির মূল শব্দ ও প্রতিফলিত অনেক অনেক শব্দের মধ্যে পড়ে আমাদের শোনাটা কেমন হচ্ছে দেখে নেওয়া যাক একবার।

প্রতিধ্বনির কথা

প্রতিধ্বনি শোনার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে। পাহাড়ে গিয়ে বা কোনও বিরাট ফাঁকা ঘরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলে একটু পর সেই চিৎকার ফিরে শোনার আনন্দে ছোটোবেলায় আমরা বিস্তর চেঁচামেচি করেছি। কিন্তু কী হয় যখন উৎস থেকে বেরোনো মূল শব্দ ও প্রতিফলিত শব্দের মধ্যে এতখানি সময়ের ফারাক না থাকে, যতখানি থাকলে মূল ও প্রতিফলিত দুটো শব্দই আমরা পরিষ্কার শুনতে পাই ছোটোবেলার সেই প্রতিধ্বনির মতো?

প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে একটা ঘটনা লক্ষ করা যাক। সিলিং ফ্যান যখন স্থির থাকে, প্রত্যেকটা ব্লেড বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। যেই চলতে শুরু করল, আস্তে আস্তে ব্লেডগুলো ঝাপসা হতে হতে একটা চক্রাকার আবছা মতো কী যেন দেখা যায়। বিজ্ঞান বলে, কোনো জিনিস পরিষ্কার দেখতে পাবার অন্যতম শর্ত হল সেটাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চোখের সামনে স্থির অবস্থায় থাকতেই হবে। চোখ দেখবে, সেই দেখার খবর মস্তিষ্ককে পাঠাবে, মস্তিষ্ক সেই তথ্য যাচাই করে বলবে বস্তুটা কী — এই সমস্তটা ঘটতে তো কিছুটা সময় লাগে। খুবই কম সময় অবশ্য, তাও লাগে। এখন চোখের সামনে বস্তুটা যদি এরই ফাঁকে নড়াচড়া শুরু করে, তখন দেখার পুরো প্রক্রিয়াটা ঘটার আগেই আরো আরো নতুন তথ্য মাথায় যেতে থাকে এবং তার ফল হল ঐ ঝাপসা চক্র।

শব্দ শোনার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম। মূল শব্দ ও তার প্রতিফলন — এই দুটো শোনার মধ্যে যথেষ্ট সময়ের ফারাক থাকল তো ভালো, দুটোই পরিষ্কার শোনা যায়। কিন্তু এই দুটো শব্দ পরপর খুব দ্রুত কানে এলে ফল ঐ একই — ঝাপসা। তখন আর কোনও শব্দই ভালো করে শোনা যায় না। একটার ঘাড়ে আর একটা এসে পড়ে। শোনার এই অনুভূতিকেই আমরা বলি গমগমে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে খালি ঘরে পরিষ্কার শুনতে পাবার একটা অন্তরায় হল প্রতিফলন। এবার প্রতিফলন কমাবো কী করে?

ছোটোবেলা দেয়ালে রবারের বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমরা খেলেছি অনেকেই। বলটা শক্ত ইঁটের দেয়ালে ছুঁড়লে ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে ফিরে আসে। এখন বলটা যদি ছোঁড়ার ভুলে দেয়ালে না লেগে, উঠোনের তারে মেলে দেওয়া মায়ের শাড়িতে লাগে? নোংরা বল মায়ের কাচা শাড়িতে গিয়ে পড়ল — এই ঘটনার অন্য সব আনুষঙ্গিক বাদ দিয়ে বলটার দিকেই আপাতত নজর রাখি যদি, দেখব বলটা শাড়িতে ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে ফিরে না এসে শাড়ির ভিতর ঢুকে গেল যেন

এবং ঐখানেই পড়ল ধপ করে। তাহলে আমি যে সর্ব-শক্তি দিয়ে বল ছুঁড়লাম, সেই শক্তির হলটা কি? শাড়ি সব শুষে নিল? ব্যাপারটা খানিকটা এইরকমই। আর এই ঘটনা থেকে আন্দাজ পাওয়া যায় কেন আমাদের রেকর্ডিং স্টুডিওর দেয়ালগুলো ঐরকম নরম নরম।

শব্দও ঐ রবারের বলটারই মতো। শক্ত জায়গায় গিয়ে পড়ল তো সজোরে ঠিকরে আসবে, নরম জায়গায় পড়ল তো দুর্বল হয়ে পড়বে।

তাহলে আমাদের রেকর্ডিং রুমের উঁচুনিচু জ্যামিতিও কি এই কারণেই? প্রতিফলন প্রতিহত করার জন্য? ভেবে দেখা যাক।

যে দেয়ালে বলটা ছুঁড়ছিলাম, সেই দেয়ালটা যদি আমার মুখোমুখি সমান্তরাল দেয়াল হয়, তাহলে বলটা আমার দিকেই ঠিকরে আসে। যদি দেয়ালটা একদিকে বাঁকা হয়, তাহলে যেদিকে বাঁকা সেদিকে ঠিকরে যায়। এখন দুটো পাশাপাশি সমান্তরাল দেয়াল কল্পনা করা যাক। একটা দেয়ালের গায়ে যদি সজোরে বলটা ছোঁড়া যায়, ধাক্কা খেয়ে ফিরে সেটা মুখোমুখি দ্বিতীয় দেয়ালে ধাক্কা খাবে, সেখান থেকে আবার প্রথম দেয়ালে — এইভাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ না ধাক্কাধাক্কির চোটে জোর কমে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। এখন এই পাশাপাশি দেয়ালদুটো যদি একে অন্যের সমান্তরাল না হয়ে, একটা একটু বাঁকা হয়? তাহলে বাঁকা দেয়ালে ধাক্কা খাওয়া মাত্রই বলটা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে না গিয়ে অন্য দিকে ছিটকে যাবে এবং ঐ মুখোমুখি দেয়ালে বারবার ধাক্কা লেগে ফিরে ফিরে আসার ঘটনাটি মূলেই বিনাশ হবে। বলটাকে যদি একটা শব্দ হিসেবে ভাবি তাহলে শব্দ যে বারেবারে প্রতিফলিত হচ্ছিল (প্রত্যেকবার ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা) পাশাপাশি সমান্তরাল দেয়ালের ক্ষেত্রে, বাঁকাচোরা দেয়ালে সেই জারিজুরি খতম। আর কানও তাহলে একই শব্দ খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে শুনে বারবার বিভ্রান্ত হয়ে যে গমগমে অনুভূতির সৃষ্টি করছিল, সেটা কিছুটা কমানো গেল।

বাঁকাচোরা দেয়াল আর একটা কাজও করছে।

বিজ্ঞান বলে, যে শব্দ যত গম্ভীর, ভারী শুনতে (low বা bass sound), তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত বড়।

প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য যেমন এর উল্টো, বেশ ছোটো।

শব্দের একটা গুণ হল, আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায়, যে ধরণের মাপ-মাত্রার (dimension) সঙ্গে আমরা অভ্যস্ত, শব্দের অনেক বৈশিষ্ট্য মোটামুটি সেই মাপে ব্যাখ্যা করা যায় এবং অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। আলোর গতির

উদাহরণ নিলে কী বলতে চাইছি পরিষ্কার হবে। আলোর গতি এমন সাংঘাতিক বেশি যে সেটা কত বেশি আমরা ঠিকমতো ধারণাই করতে পারি না। মাপটা আমাদের কাছে একটা সংখ্যামাত্র। শব্দের ব্যাপারটা তা নয়। এই গম্ভীর শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্যই যেমন; তার দৈর্ঘ্য এমন হতে পারে, যে তা আমাদের ঘরের দৈর্ঘ্য বা প্রস্থের সঙ্গে মিলে যাওয়াটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। আর সত্যি সত্যিই যখন সেটা হয়, কোনো শব্দতরঙ্গের দৈর্ঘ্য আর ঘরের মুখোমুখি দুই সমান্তরাল দেয়ালের মাঝের দূরত্ব যখন সমান হয়ে যায়, তখন সেই তরঙ্গ আর ছিটকে অন্যদিকে পালাবার পথ না পেয়ে দুই দেয়ালের খাঁচায় আটকে শক্তি বাড়াতে থাকে। আর আমরা সেই বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শব্দটি বেশি বেশি শুনতে থাকি। এই ঘটনাটা কেবলমাত্র ভারী বা গম্ভীর শব্দের ক্ষেত্রে ঘটে বলে বাঁয়ার আওয়াজ, ড্রামের কিক্ ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে, এ'গুলি বেশি বেশি শোনা যায় এবং শব্দ-মিশ্রণের সময় এই সব শব্দ ঠিকমতো ব্যালান্স করা বেশ কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

যে পাত্রে ঢালিবে

শব্দ চরিত্রের দু'একটা দিক তাহলে পরিষ্কার হল এবং বোঝা গেল, শব্দ কী ধরনের জায়গায় হচ্ছে, তার উপরেই অনেকখানি নির্ভর করছে সেই শব্দ কী রকম শুনতে লাগবে। শব্দের এই চরিত্রের সঙ্গে তরল পদার্থের একটা বৈশিষ্ট্যের মিল আছে। তরল যেমন যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের আকার নেয়, শব্দও তেমন যে ঘরে শুনছি সেই ঘরের মাপজোখ, ধরন-ধারণ অনুযায়ী নিজের একটা চেহারা নেয়। তাই যদি হয়, তাহলে আমাদের দৈনন্দিন শোনার যে অভিজ্ঞতা তা নিশ্চয়ই শব্দের 'খাঁটি' রূপ নয়। (প্রকৃতপক্ষে, শব্দের 'খাঁটি' রূপ যে ঠিক কী, তা বলা কঠিন, কারণ শোনা ব্যাপারটা সব সময়ই আপেক্ষিক)। আমাদের বাড়ির দেয়ালে কোনো কারিকুরি নেই, মেঝেতে খুব বেশি হলে একটা মাদুর, কি একটা সতরঞ্চি বা একটু জায়গা জুড়ে কার্পেট পাতা, ছাত পুরোটাই ফাঁকা, সিলিং ফ্যান ঝুলছে; আর একটু শৌখিন হলে এক-আধটা ল্যাম্পশেড। এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, আমরা যে শোনার কথা আলোচনা করছি, সেটা কোনো reproduction নয়, মানে বাদ্যযন্ত্র বা গাওয়া সামনাসামনি শুনছি, সিডি বা টেপ চালিয়ে নয়। সেটা হলে আরো কয়েকটা বিষয় জুড়ে যাবে যা এই পরিসরে আলোচ্য নয়।

এই সব ঘরে আমরা যখন গানবাজনা শুনছি, সেটা নানা ধাক্কাধাক্কির পরে পাওয়া একটা শব্দ-রূপ। যেটা বহু বহু বছর ধরে মানুষের স্মৃতিতে রয়েছে। এটা একজন কোনো মানুষের স্মৃতির ব্যাপার নয়, বহু যুগ ধরে ঘটে চলা শব্দের একটা সামাজিক স্মৃতির কথাই আমি বলতে চাইছি। যে স্মৃতিতে শব্দের একেবারে 'খাঁটি' রূপ বলে আসলে কিছুই নেই, যেখানে শব্দের character তৈরিই হয়েছে 'খাঁটি' শব্দটির সঙ্গে এরকম নানা প্রতিফলিত শব্দের 'ভেজাল' মিশে। এই error বা ত্রুটিটুকু বাদ দিলে শব্দ কেমন যেন নিষ্প্রাণ লাগে শুনতে। এই কারণেই কি রেকর্ড করা গানে বা বাজনা বিশেষে একটু reverb বা delay যোগ করে শুনতে আমাদের ভালো লাগে? রেকর্ডিং শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সকলেই জানেন এই বাক্যটি 'শুনতে dry লাগছে'। অর্থাৎ, রেকর্ড করা শব্দটির মধ্যে যথেষ্ট প্রাণ নেই মনে হচ্ছে যেন।

তাহলে প্রশ্ন হল, এত কাণ্ড করে রেকর্ড করার ঘর না বানিয়ে, সাধারণ ঘরে বসে রেকর্ড করলেই তো হয়? এক নম্বর উত্তর, কাণ্ড করার দরকার আছে, তবে সে কাণ্ডে এখন আমরা নজর দেব না, রামায়ণ হয়ে যাবে। দু'নম্বর উত্তর হল, ঘরে রেকর্ড হয় এবং হচ্ছেও। সকলেই জানেন ২০১২-তে পণ্ডিত রবিশঙ্করের যে অ্যালবামটি গ্র্যামি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছিল, 'Living Room Sessions - Part 1' — সেই রেকর্ডিং তাঁর আমেরিকার বাড়ির লিভিং রুমে করা হয়েছিল। সঠিক জানি না, তবে ধরেই নেওয়া যায় উনি ওঁর বাড়ির লিভিং রুম রেকর্ডিং স্টুডিওর মতো করে বানাননি। আমাদের এখানে অবশ্য এমন চেষ্টা না করাই ভালো। পাড়াভেদে কিঞ্চিত এদিক ওদিক হতে পারে, তবে গাড়ির হর্ন আর ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরির মিলিত ambience ছাড়া আমাদের শহরের লিভিং রুমে কিছু শোনা যায় বলে মনে হয় না।

যে বন্ধুদের রেকর্ডিং-এর কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেই কথায় ফেরা যাক এবার। এঁরা সকলেই লোক-শিল্পী। স্টুডিওতে গাইলেও এঁরা ঠিক স্টুডিওর রীতি মেনে গাইতে অভ্যস্ত নন। স্টুডিওর রীতি হল, একজন একটা যন্ত্র বাজালেন, সেই বাজনা শুনে আর একজন আর একটা যন্ত্র তার সঙ্গে মিলিয়ে বাজালেন। এগুলো শুনে গায়ক গাইলেন, ইত্যাদি। সব শব্দই আলাদা করে রেকর্ড হল। এবং কৃত্রিমভাবে না মেশানো পর্যন্ত প্রতিটা যন্ত্র ও গান আলাদাভাবেই রইল। আমাদের শিল্পীরা যেহেতু একসঙ্গে গান করেন ও বাজান, তাঁদের সেইভাবেই রেকর্ড করতে হয়। তার ফলে শব্দের প্রতিটা উৎস আলাদাভাবে রেকর্ড করা সম্ভব হলেও,

প্রত্যেক শব্দের সঙ্গে আশেপাশের অন্যান্য শব্দও মিশে থাকে। মিশ্র শব্দ reverb বা delay দিয়ে মধুর করতে গেলে অনেক বিপত্তি। একটি বিশেষ শব্দের উপর মনোযোগ দিতে গেলে অন্য আর একটি শব্দ প্রায় অশ্রাব্য হয়ে পড়ার ভয় থাকে। এছাড়া শিল্পীদের সাচ্ছন্দও একটা বড়ো বিষয়। গান গাওয়ার পরিবেশ এমন হতে হবে, যেখানে পরিবেশ-পরিস্থিতি গানের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে না। নড়া-চড়া, মাথা ঝাঁকানো, মাইক থেকে একটু-আধটু সরে যাওয়া, কথা-বার্তা, ধূমপান — সব একসঙ্গে হলে তবে গানটাও প্রাণবন্ত হবে। নানা জায়গায় ঘুরে লোক-শিল্পীদের গান রেকর্ড করার কিছুটা অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, শিল্পীরা সব থেকে সচ্ছন্দ নিজেদের জায়গায় — বাড়িতে বা আশেপাশেই, পরিচিত সহশিল্পীদের সঙ্গে। কেউ কেউ স্টেজেও বেশ সাবলীল।

এই সাবলীলতা ধরতে গেলে আমাদেরই পৌঁছতে হবে শিল্পীদের নিজস্ব জায়গায়। পৌঁছনোটা কঠিন নয়, তবে পৌঁছে কোথায় রেকর্ড করব? বিভিন্ন রকমের বাড়িতে রেকর্ড করে দেখেছি মাটির বাড়ি-খড়ের চাল একত্রে রেকর্ডিং-এর স্থান হিসেবে বেশ ভাল। শব্দ পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে মাটি বেশ খারাপ। দেয়াল যদি যথেষ্ট পুরু হয়, বাইরের শব্দ ভিতরে আসা অনেকখানিই আটকানো যায়। অবশ্য আমি ধরে নিচ্ছি বাড়িটা গ্রামের মধ্যে কোথাও, মোটামুটি ফাঁকা জায়গায় এবং পাশেই হাইওয়ে বা ট্রেনলাইন নেই।

মাটির বাড়ি

মাটি যেহেতু স্বভাবতই ফুটো ফুটো (porous), এবং কংক্রিটের থেকে নরম, একেবারে নিরেট নয়, মাটির দেয়ালে কোনও কারিকুরি ছাড়াই শব্দতরঙ্গ অনেকখানি শোষিত হয় এবং বিশেষ প্রতিফলিত হয় না। যাঁদের মাটির বাড়ির বিষয়ে কিছুটা জানা আছে তাঁরা জানেন, পাকা বাড়ির একটা ফাঁকা ঘরে শব্দ করলে যেমন গমগম করে ওঠে, মাটির বাড়ির একই আয়তনের একটা ফাঁকা ঘরে শব্দ করলে ঠিক তেমনটি হয় না।

আমাদের এক বন্ধু — অনেকের কাকা — সিউড়ির নিতাই দা, নিজের আশ্রম করেছেন গ্রামের এক প্রান্তে। মাটির বেশ মোটা দেয়ালের বাড়ি। আর পাঁচটা বাড়ির মতো চৌকো নয়, গোল। আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি, মুখোমুখি দুটো সমান্তরাল দেয়াল রেকর্ডিং-এর জন্য অনুকূল নয়। গোল বাড়িতে এই সমস্যা নেই। বিজ্ঞানের আতশকাচ দিয়ে দেখলে দুটো মুখোমুখি সমান্তরাল বিন্দু

অবশ্যই পাওয়া যাবে। তবে ঐ যে ত্রুটি বা 'ভেজাল'-এর কথা হচ্ছিল, আমাদের তো আবার সেটাও চাই।

কলকাতায় সেই স্টুডিও রেকর্ডিং হবার পরের বছর আবার রেকর্ডিং হবে ঠিক হল যখন; আমরা ভাবলাম এবারে নিতাইদার গোলবাড়িটাতে রেকর্ড করা যাক। ওখানে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, আমরা রেকর্ডিং-এর সময় বিদ্যুৎ চুরি করেছিলাম একথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। এই গ্রামে সবাই মিলে দু'দিন থেকে প্রচুর গান হল, খাওয়া-দাওয়া হল আর রেকর্ডও হল অবশ্যই।

এই রেকর্ডিং-এ যদি একটার বেশি মাইক ব্যবহার হয়, তাহলেও তো রেকর্ডিং-এর সময় কোনও একটা ট্র্যাকে একটার সঙ্গে অন্য শব্দ মিশে রেকর্ড হচ্ছে? ঠিকই। সেসব সমস্যা মোকাবিলার কিছু কিছু পদ্ধতি আছে, সেটা এখানে আলোচনার পরিসর নেই, তবে সব মিলিয়ে যে শব্দ শোনা যাচ্ছে, তা কিন্তু শ্রুতিমধুর এবং পরিষ্কার। পাকা বাড়ির ফাঁকা ঘরের মতো অপরিষ্কার ও গমগমে নয়। তবে যে শব্দ শোনা যাচ্ছে, সেই একইরকম শব্দই যে রেকর্ড হচ্ছে তার কোনও মানে নেই। সেটা নির্ভর করছে যিনি রেকর্ড করছেন তিনি কীভাবে রেকর্ড করতে চাইছেন তার উপর। আর একটা বিষয় অবশ্যই যন্ত্রপাতি। কী ধরণের মাইক, রেকর্ডার ব্যবহার হচ্ছে তার উপরেও অনেক কিছু নির্ভর করে। মোবাইল ফোনের উদাহরণ হাতের কাছেই রয়েছে। আজকাল অনেকেই নানাবিধ ঘটনা মোবাইলে রেকর্ড করে থাকেন। সেটা পরে চালিয়ে শোনা বা দেখার সময় তার গুণগত মান আর যা শোনা বা দেখা গেছিল সেটা নিশ্চয়ই একইরকম হয় না — একথা সকলেই জানেন। শব্দ কেমন খ্যানখেনে হয়ে যায়, ছবিগুলো ফ্যাকাসে মতো। ছবির মান আজকাল অবশ্য ভালো হচ্ছে বিশেষ বিশেষ মোবাইলের ক্ষেত্রে। যাই হোক, কথাটা হল আমাদের এগুলো দেখতে খারাপ লাগে না, যদি বিষয়টার প্রতি আমাদের আগ্রহ থাকে।

গুণগত মানের সঙ্গে শোনার আসক্তি বা আগ্রহের সেভাবে কোনো সম্পর্কই নেই। কারো যদি আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের গান ভালো লাগে তিনি ইচ্ছে করলে সেই গান বারেবারেই শুনবেন। তার clarity যেমনই হোক না কেন।

যে কোনও সঙ্গীতেরই একটা নিজস্ব শব্দ আছে। বাউল একরকম শুনতে, ঝুমুর আর একরকম, কীর্তন আর একরকম, ভাওয়াইয়া আরো একরকম — বিভিন্ন ধারার সঙ্গীত তার নিজস্ব ধ্বনি সম্পদে সমৃদ্ধ। যাঁর আসক্তি আছে, তাঁর অন্তরে সেই ধ্বনি ধরাও আছে। গান-বাজনা শোনার সময়, এই নিজস্ব ধ্বনি-

রূপটা সৃষ্টি হচ্ছে কি না, সেটাই মিলিয়ে নিই বোধহয় আমরা, সে যেখানে বসেই শুনি না কেন। এই যাদবপুর অঞ্চলে একজন বাউল, ভক্তদাস, নিয়মিত গান গেয়ে মাধুকরী করতে আসেন। জোরালো গলায় দোতারা বাজিয়ে গান করেন। পাড়ায় ঢুকলেই টের পাওয়া যায় ভক্তদাস এসেছেন। তীব্র কণ্ঠ এই কংক্রিটের জঙ্গলের দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে গমগম করে ছড়িয়ে পড়ে। ভক্তদাসের গান যদি আমরা বীরভূমের গ্রামের বাড়িতে বসে শুনি, তাহলে এই শোনা আর যাদবপুরের ফ্ল্যাটে বসে শোনার অভিজ্ঞতার তফাত হবে নিশ্চয়ই। ভক্তদাসের গান তো আর বদলাবে না, শোনাটা বদলে যাবে।

প্রশ্ন হল তাহলে ভক্তদাসের মতো কাউকে কোথায় রেকর্ড করব? নিতাইদার মাটির বাড়িতে টেনে নিয়ে যাব? সম্ভব হলে যাব হয়তো। কিন্তু এখানেও কি করব না? এই যাদবপুরের রিয়্যালিটিতে? এখানেই আমি ঐ আসক্তির কথায় ফিরে যেতে চাইছি। আমরা কি শ্রোতা হিসেবে প্রস্তুত শব্দকে তার সমস্ত আনুষঙ্গিক সহ গ্রহণ করতে? নাকি context নির্বিশেষে সবই হিমঘরে ঢোকাব?

এই লেখায় উল্লিখিত তিনটি জায়গায় (যাদবপুর, গোলঘর, স্টুডিও) রেকর্ড করা গানের টুকরো এখানে রইল — http://db.tt/yRBEwJnt
আগ্রহী পাঠক শুনে দেখতে পারেন।

সুকান্ত মজুমদার একজন সাউন্ড রেকর্ডিস্ট, মূলত ফিল্ম এবং থিয়েটারে কাজ করেন; এছাড়া তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিল্ড রেকর্ডিংও করেন। বাউল ফকির উৎসবের শুরু থেকেই শ্রোতাদের শব্দ শোনানোর দায়িত্ব তাঁর উপর রয়েছে।

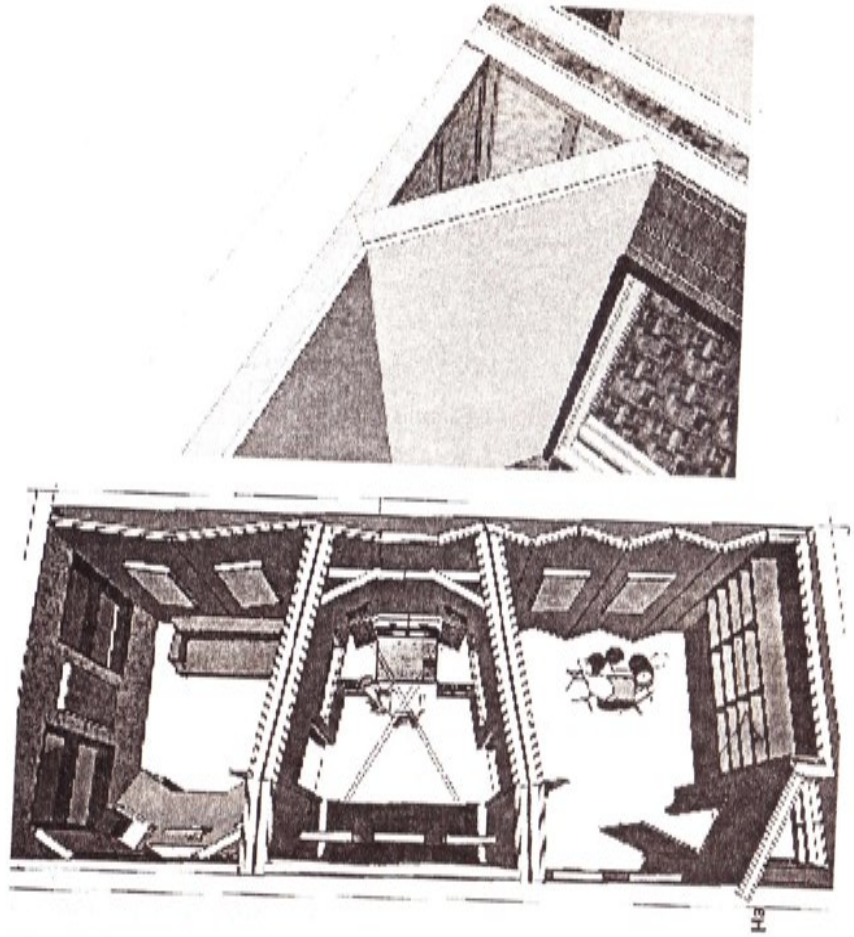

সাউন্ড স্টুডিও

মধ্য প্রদেশের দেওয়াস শহরের কাছে শীলনাথ ধুনি সংস্থান মন্দিরের একটি আয়না। এই মন্দিরে কুমার গন্ধর্ব প্রায়ই যেতেন। ছবিটি তুলেছেন শবনম ভিরমানি।

সূত্র : The Kabir

কবীরের সঙ্গে পথচলা

মূল ইংরেজি : শবনম ভিরমানি

অনুবাদ : কবীর চট্টোপাধ্যায়

আমার কবীর-চর্চা শুরু হয় ২০০২ নাগাদ। গোধরা-কাণ্ডের সময় আমি আমেদাবাদে থাকতাম, তাই সেই সময়ে গুজরাটে যে ভয়ানক মুসলমান-বিরোধী নৃশংসতা চলছিল, তা নিজের চোখে দেখেছি আমি। এমন এক সময়েই যেন কবীরের ডাক এসে পৌঁছেছিল আমার কাছে, 'সাধো, দেখ জগ বৌরানা।' (হে সাধক, দেখ এ বিশ্ব উন্মাদ হয়ে গেছে।) নিজের অজান্তেই ভাবতে শুরু করলাম, আরে, এই লোকটা তো আমারই মনের কথা বলে ফেলল!

২০০৩ সালে আমি ক্যামেরা হাতে পথে নেমে পড়লাম, বেরিয়ে পড়লাম নানারকম সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং সাঙ্গীতিক প্রেক্ষাপট থেকে আসা বিভিন্ন মানুষের সাথে দেখা করতে, যাঁরা সারাটা জীবন কাটিয়েছেন কবীরের গান গেয়ে, কবীরকে ভালোবেসে, শ্রদ্ধা করে, কবীরকে বোঝার চেষ্টা করে। তার ছ'বছর পরে আমার সেই অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলো কিছুটা ব্যক্ত করতে পেরেছিলাম চারটে ডকুমেন্টারি ফিল্ম এবং অনেকগুলো বই ও গানের সিডি-র মাধ্যমে। কিন্তু আমার এই বাহ্যিক 'পথে নেমে পড়া'টার পাশাপাশি, বোধহয় কবীরেরই ক্রমাগত উস্কানির চোটে, আমি নিজের মধ্যেও এরকম যাত্রা শুরু করেছিলাম বলা যায় — তাই আমার গল্পটা ঠিক আমার নির্দেশমতো চলতে পারল না। সেই গল্পে কবীর আমার জন্য অনেকরকম চমক, অনেকরকম পরিবর্তন লুকিয়ে রেখেছিলেন।

আমি পথে নেমেছিলাম এই ভেবে, যে আমার চারপাশে যাঁরা এরকম উদ্‌ভ্রান্ত নৃশংসতায় মেতেছে, তাদের কাছে কবীরের কথা পৌঁছে দেব। কিন্তু তার আগেই কবীর কথা বলতে শুরু করলেন, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে নয়, আমার নিজের মধ্যে, আমারই সঙ্গে। আমার মনের ভিতরের নানা ফাঁকফোকর আমায় চোখে

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন; দেখিয়ে দিলেন, নিজের 'আমিত্ব'টাকে গড়ে তুলতে বা ধরে রাখতে গিয়ে আমি নিজেই কত রকম নির্মমতা (প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ) এবং অসত্যের আশ্রয় নিয়ে থাকি। কবীর আমাকে দেখিয়ে দিলেন, আমি কীভাবে আমার চারপাশের নানা মানুষকে 'অপর' বা 'আদার' বলে ভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে ফেলি, কেবল নিজের পরিচিতিটা নিজের কাছে অটুট রাখবার জন্য; আর কীভাবেই বা এই শ্রেণিবিভাগের স্বভাবটা আমাকে 'নিজেকে দেখা-বনাম-পৃথিবীতে দেখা'র এক বিচিত্র দ্বৈত মানসিকতার মধ্যে বন্দি করে রাখছে। এই মানসিকতাটাও কিন্তু কোনো ধর্মীয় সংঘর্ষের চেয়ে কম ভয়ানক বা বিভাজনকারী নয়। আমি আস্তে আস্তে দেখতে শিখলাম যে আমর ভিতরের এই নিজের দুনিয়াটাই আমাকে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে বেঁধে রেখেছে, আমাদের প্রত্যেকের নিজের ভিতরের নৃশংসতা বা অসত্যগুলোই কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব বড়ো মাপের যুদ্ধ বা সংঘর্ষের জন্ম দেয়। আমরা নিজের না হোক, আমাদের দেশ বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর সম্মিলিত 'আমিত্ব'কে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়েই কিন্তু বাকিদের শ্রেণিবিভাগ করে এই 'অপর'-এর তকমা এঁটে দিই। আমার পথ চলায় এই শিক্ষাটা অপ্রত্যাশিতভাবেই এল; যে সামাজিক পরিস্থিতিকে কাঠগড়ায় তোলার পরিকল্পনা নিয়ে আমি বেরিয়েছিলাম, নিজেকেও যে সেই সমাজেরই অংশ হিসেবে চিনতে শিখতে হবে — অন্তত কিছুটা তো বটেই — এটা আমি কল্পনা করিনি।

বুরা যা দেখন ম্যাঁয় চলা, বুরা না মিলিয়া কোই,
যো মন খোজা অপনা, মুঝসে বুরা না কোই।।

আর একটি বিখ্যাত দোঁহায় কবীর বলছেন —

কবীর খড়া বাজার মেঁ, লিয়ে লুকাঠি হাত,
যো ঘর বারে আপনা, চলে হামারা সাথ।।

এই গানে 'ঘর'-এর মানে অনেক কিছুই হতে পারে, তার অর্থ খুঁজতে খুঁজতে অনেক গভীরে চলে যাওয়া যায়। তবে লেখাটা একবার পড়েই যেটা স্পষ্ট বোঝা যায় সেটা হল, দেয়ালের কথা; আত্মপরিচয়ের দেয়াল, যা আমরা 'ওদের' সঙ্গে 'আমাদের' পার্থক্য বজায় রাখতে গড়ে তুলি। আমাদের এই সুখের ঘরের কোণ থেকে কবীর আমাদের ঠেলে বার করে দিচ্ছেন, আমাদের এই অতি সাবধানে, হিসেব করে গড়ে তোলা নানারকম আত্মপরিচয়ের নির্মিতি থেকে, যা আবার ঠিক আমাদের ঘর-বাড়ির মতোই — বস্তুকেন্দ্রিক, স্থাননির্ভর এবং অত্যন্ত ভঙ্গুর। এই

স্বনির্মিত ছবিটিকে সারা জীবন ধরে সময় এবং দিন বদলের ঝড়-ঝাপটার আঘাত থেকে আমাদের আগলে রাখতে হয়। এমন তো নয় যে, আমাদের এই সমস্ত বিশ্বাস বা মানসিক গঠনকে পুরোপুরি বিসর্জন দিতে হবে, তবে মাঝে মাঝে এর বাইরে বেরিয়ে এসে, একটু হালকাভাবেই, কিছুটা বিস্ময়, এমন কী কিছুটা কৌতুকও মিশিয়ে, চারপাশের জগতের বৈচিত্রের অংশ হিসেবেই নিজের বিশেষত্বকে খুঁটিয়ে দেখা — এটুকু সামর্থ আমাদের অবশ্যই থাকা উচিত। বলাই বাহুল্য, কাজটা খুব সহজ নয় এবং কবীর যখন বলছেন যে তাঁর নিজের বাড়ি পর্যন্ত যাওয়াটাও বেশ কঠিন কাজ, পা পিছলে যেতে চায়, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

কবীর কা ঘর শিখর পে, সিলহলি সি গৈল,
ওয়াহাঁ পাওঁ না টিকে, পপীল কা, কিঁউ মনওয়া লাডে বৈল?

কাজটা যতই শক্ত হোক, কবীর কিন্তু নিজেই এই পথে আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক; তাঁর নিজের বিস্ময়কর, বিচিত্র জীবনযাপনের মধ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতির, মানুষের আর গোষ্ঠীর নানারকম ছাপ রয়ে গেছে। বহু লোকাচারে, বহু পরস্পরবিরোধী সামাজিক ব্যবস্থায় কবীরের স্থান রয়েছে, কিন্তু কোনো একটি বিশেষ মতের সাহায্যে তাঁকে ধরে রাখা বা তাঁর পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। কবীর কেবল দলিতদের হয়ে কথা বলেছেন, এই অনুমান যাঁদের অত্যন্ত বিরক্ত এবং আহত করে, এমন অনেক উচ্চ-বর্ণের হিন্দুর সাথে আমার পথচলায় আমি আলাপ করেছি। আবার এমন অনেক দলিত সমাজকর্মীকে দেখেছি, যাঁরা ব্রাহ্মণদের কবীর-চর্চাকে যথেষ্ট বিদ্রূপের চোখে দেখেন। কবীরের হিন্দু ভক্তরা কবীরের কাজে সুফি সংস্কৃতির অনুসন্ধান খবু একটা মেনে নিতে পারেন না; আবার কবীর সুফি ছিলেন না, এ কথা শুনলে অনেক সুফি গায়ক হাসিতে ফেটে পড়বেন। নাস্তিক সমাজকর্মীরা কবীরের দোঁহা আন্দোলনের স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করেন, আবার ধর্মভীরু কবীরপন্থীরা, যাঁরা কবীরকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছেন, তাঁরা সেই দোঁহাগুলোই মন্দিরের আরতির সময়ে প্রার্থনা-সঙ্গীত করে নেন। কবীরের এই একাধিক রূপের সামাজিক বৈশিষ্ট্যই আমাদের নিজেদের হৃদয় এবং মন খুলে ভাবতে শেখার দিকে বারবার ঠেলে দেয়। কোনো ধার্মিক হিন্দু ভক্ত যদি শোনেন, যে তাঁর ভক্তি এবং ভালোবাসার কবীরকেই ('বিপাসনা' নামক একটি বৌদ্ধ আধ্যাত্মিক গোষ্ঠীর জনক) এস.এন. গোয়েঙ্কা মহাশয় 'বিপাসী' বলে ব্যক্ত করেছেন, হিন্দু ভক্তটির মনে কৌতূহল জাগতেই পারে; সে

মন দিয়ে শুনবে, বুঝবে এবং আশা করা যায়, তার মনে কোথাও একটা নতুন জানলা খুলে যাবে।

তাই, কবীরেরই প্ররোচনায়, আমার চারটি ডক্যুমেন্টারির প্রত্যেকটিই নানারকম সীমানা পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেটা বাহ্যিক, ভৌগোলিক সীমানাও হতে পারে, আবার আমাদের মনের অন্ধকার, দুর্বোধ্য জটিলতার ভিতরের নানারকম সীমানাও হতে পারে। ধর্ম এবং জাতীয়তাবাদ থেকে জন্ম নেওয়া বিভেদগুলোকে খুঁটিয়ে দেখা, এবং ভারত থেকে পাকিস্তানে যাত্রার নানা কথা নিয়ে 'হদ অন্‌হদ' : জার্নিজ উইথ রাম এন্ড কবীর' ফিল্মটি বানানো হয়েছিল।

'কোই সুনতা হ্যায় : জার্নিজ উইথ কুমার এন্ড কবীর' শিক্ষা, শিল্প এবং সঙ্গীতের জগতে আমাদের গড়ে তোলা শ্রেণিবিভাগ নিয়ে একটি ছবি। এখানে 'ঘর' এর উপমাটি ফিরে আসে 'ঘরানা'র রূপে; হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে আক্ষরিক অর্থে যার মানে 'বাড়ি' বা 'ঘর'। অনেক সময়েই দেখা যায় যে এই আলাদা আলাদা ঘরানাগুলো উন্নাসিকতা, স্বাতন্ত্রের অহঙ্কার এবং বিচ্ছিন্নতার ফাঁদে পড়ে আটকে যায়। এই ছবিটিতে প্রখ্যাত গায়ক কুমার গন্ধর্বের ইতিহাস আমরা দেখতে পাই, দেখতে পাই কীভাবে নিজের ঘরানা, নিজের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আভিজাত্যকে 'পুড়িয়ে' ফেলার সাহস তিনি পেয়েছিলেন।

কোনো একটি শাস্ত্রীয় ঘরানায় আবদ্ধ থাকতে যে তিনি শুধু রাজি হননি তাই নয়, 'অপরের' পথে নেমে, লোকসংগীতের থেকে শিক্ষা অর্জন করে তিনি যে ঔদার্য এবং বিনয়ের পরিচয় দিয়েছিলেন তা দুর্লভ। এরকম সৃজনশীল, কিছুটা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার কিন্তু রাজনৈতিক বা সামাজিক বিরোধিতার জগতেও একইরকম প্রয়োজন — 'অপর' দিকে যাওয়ার সামর্থ, ধৈর্য্য ধরে 'অপর' দিকের যুক্তি শোনার এবং বোঝা এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে নিজেকে পাল্টে ফেলার সামর্থ। কুমার গান্ধর্ব এটা করে দেখিয়েছেন এবং ঠিক এই কারণেই তাঁর গাওয়া কবীরের গানকে সাঙ্গীতিক শ্রেণিবিভাগের মধ্যে ধরা যায় না; কবীরের নিজের মতোই তাঁর গানেও কোনো তকমা আঁটা সম্ভব নয়, তাই বিভিন্ন মানুষের কাছেই তাঁর গান এতটা সৎ, এতটা মধুর, এতটা কাছের মনে হয়।

আমার মনে হয় এই ভাগাভাগির সমস্যার সমাধান করতে হলে আমাদের কেবল তফাত 'মেনে নিলে'ই হবে না, তফাতের ভিতরেই বন্ধুত্বও পাতাতে হবে। 'চলো হামারা দেশ : জার্নিজ উইথ কবীর এন্ড ফ্রেণ্ডস' ফিল্মটি গ্রামীণ দলিত লোকসঙ্গীত শিল্পী, প্রহ্লাদ টিপানিয়ার সঙ্গে আমেরিকার অধ্যাপক-অনুবাদক, জেন

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লিন্ডা হেস-এর বন্ধুত্ব নিয়ে; মালওয়ার গ্রামীণ সমাজের কবীরের সঙ্গে মার্কিন অধ্যাপকের বন্ধুত্ব। এই দুই সংস্কৃতির লেনদেন নিয়েই ছবি, এক অদ্ভুত মেলবন্ধন, যাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে এই দু'জন মানুষের উদারতা। গ্রামীণ ভারতবর্ষ এবং উত্তর আমেরিকার ছবিগুলো তুলে ধরতে ধরতে এই ডক্যুমেন্টারিটি আসলে চেষ্টা করেছে মনের হদিস নিতে, হৃদয়ের হদিস নিতে, পার্থক্যকে উপেক্ষা করে একে অপরকে বুঝতে শেখার চেষ্টায় সাঁকোগুলো গড়ে তুলতে।

কবীর হলদি পীয়ারি, চুনা উজ্জ্বল ভাই,
রাম স্নেহী ইউঁ মিলে, দোনো বরণ গওয়াই।।

তাই আমিও ঠিক করেছিলাম 'অন্য' দিকের পথে নামব, জোর করে এমন দিকে যাব যেখানে আমি অস্বস্তি বোধ করি। একেই ছোটোবেলা থেকে নাস্তিক পরিবেশে বড় হয়েছি, তার উপর কুড়ি থেকে তিরিশ বছরের দশকগুলোয় নানা সামাজিক আন্দোলনের বামপন্থী চিন্তাধারা আমার উপর বেশ একটা প্রভাব ফেলেছিল। অতএব, ধর্ম, পুজো-আর্চ্চা এবং গুরু-মহারাজদের উপর আমার একেবারেই কোনো ভরসা বা শ্রদ্ধা ছিল না। কবীরকে ধর্মীয় প্রেক্ষাপট থেকে যখন বোঝার চেষ্টা শুরু করলাম, আমার নিজের প্রতিক্রিয়াতে আমি যথেষ্ট উদ্ভ্রান্তি, বিস্ময় এবং অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম; প্রথমে এল একটা দিশেহারা ভাব, তারপর আস্তে আস্তে, প্রায় নিজের অজান্তেই, সহানুভূতি।

২০০৩ সালে আমি ছত্তিসগড়ের দমাখেড়া নামে একটি ছোটো গ্রামে তিন দিন কাটিয়েছিলাম, সেখানে তখন 'ধরমদাসী কবীরপন্থী গোষ্ঠীর' ভক্তেরা চারদিকে জড়ো হচ্ছেন তাঁদের বার্ষিক 'চৌকা আরতি' পরব উপলক্ষে, যেখানে আনুষ্ঠানিক ভাবে গুরুর পুজো করা হয়। সমালোচকের চোখ দিয়ে আমি অনেক কিছুই দেখতে পেলাম; ধর্মের শ্রেণিবিভাগ করার মানসিকতা, রাজনীতি এবং বাণিজ্যের সাথে তার অশুভ সংযোগ, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নানারকম বিকৃতি এবং ছলচাতুরি। কিন্তু একই সঙ্গে, মানুষ কী অসম্ভব বিশ্বাস এবং উৎসাহ নিয়ে সেখানে আসছেন, সেটাও আমাকে অভিভূত করেছিল। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যে কতটা শক্তিশালী এবং কীভাবে মানুষকে আকর্ষণ করে, তা আস্তে আস্তে চিনতে শিখলাম। যা কিছু আমাদের কাছে মূল্যবান, তারই চিহ্ন হয়ে ওঠে এইসব অনুষ্ঠান, বাৎসরিক উৎসবের এই বিশেষ দিনগুলিতে। যে গুণ আমরা নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলতে চাই, বার বার তার কথা মনে করিয়ে দিয়ে, আমাদের মতো যাঁরা একই জিনিসের

অন্বেষণ করছেন, তাঁদের সাথে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে, একসাথে বাঁচার বহু মুহূর্ত সৃষ্টি হয় এমন সময়।

নিজের মধ্যেকার এই অস্বস্তিকর টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছিল 'কবীরা খড়া বাজার মেঁ : জার্নিজ উইথ সেক্রেড অ্যান্ড সেক্যুলার কবীর' ছবিটি। প্রহ্লাদ টিপানিয়া, যিনি 'একলব্য' নামে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়েও 'মহন্ত' (যাজক বিশেষ) হিসেবে 'কবীর পন্থ'-তে যোগ দেন, তাঁর জীবনের নানা দায়বদ্ধতা, দ্বন্দ্ব এবং বৈপরীত্য নিয়েই এই ছবি। এই মানুষটি কবীরের শিক্ষাকে সচেতনভাবেই নিজের জীবনযাপনের মধ্যে কাজে লাগাতে গিয়ে অনেক সমস্যার সামনে পড়েছিলেন। সেই পরস্পরবিরোধী নানা মানসিকতার লড়াই — ব্যক্তি বনাম গোষ্ঠী, আধ্যাত্মিক বনাম সামাজিক, সামাজিক অনুশাসন বনাম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র — এই লড়াইগুলোকেই খুঁটিয়ে দেখতে চেয়েছে আমার ছবি।

বহু জায়গায় এই ছবি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি, নাগরিক উচ্চশ্রেণির মানুষেরা প্রায়শই একরকম উন্নাসিকতার সঙ্গে কবীরপন্থার গুরুত্বকে উড়িয়ে দেন। আমরা কত সহজে, সব দিক বিবেচনা না করেই বিচার করে ফেলি, সেটা দেখে আমি বিরক্ত হই। মনে হয়, 'আমাদের' অনুষ্ঠানগুলো 'ওদের' অনুষ্ঠানের তুলনায় অনেক ভালো, এটাই বলতে চাওয়া হচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, আমাদের আচার-অনুষ্ঠানগুলো আমাদের জীবনের সাথে এতটাই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে, সেগুলোকে আমরা আর আচার-অনুষ্ঠান বলে চিনতে পারি না। অথচ 'ওদের' আচারগুলোকে আমরা অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারের নামে বিদ্রূপ করি। এই ছবিটি নির্মাণের মধ্য দিয়ে আমি আচার-অনুষ্ঠানের নানা বৈশিষ্ট্যকে আর একটু তলিয়ে দেখার, আর একটু সহানুভূতির সঙ্গে বোঝবার চেষ্টা করেছি। এখন বুঝতে পারি, কবীর যে ঠিক ধর্মগ্রন্থ, আচার-অনুষ্ঠান বা (ধর্মকে ঘিরে গড়ে ওঠা) জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রচার করছেন, তা কিন্তু নয়। তাঁর যুক্তি হল, অভিজ্ঞতার অভিঘাত এবং তীক্ষ্ণ আত্মজিজ্ঞাসা না থাকলে, আমরা এইসব পাঁজি-পুঁথি, আচার-বিচার বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে আঁকড়ে ধরে আমাদের সংশয়পূর্ণ 'আমি'গুলিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে পারি মাত্র। এ সব কিছুই তখন ফাঁকা, অনর্থক আসবাবের মতো হয় যায়; সামাজিক বিভেদ এবং শোষণ জন্ম নেয় এই অন্তঃসারশূন্য উপলক্ষ্যগুলো থেকেই।

সমস্ত সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং নীতিগত কর্ম যে ব্যক্তিগত স্তর থেকেই শুরু করতে হবে, সাধনা যে একান্ত একাকী যাত্রা, তা নিয়ে কবীর কখনো দ্বিমত প্রকাশ করেননি।

লালাঁ কি নহী বোরিয়াঁ, হানসোঁ কি নহী পাত,
সিনহাঁ কি নহী লেহাড়ে, ঔর সাধু না চলে জমাত।।

কিন্তু কবীর আবার এও বলে দিচ্ছেন যে, একজন সৎ সাধকের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক যাত্রা তাঁকে তাঁর চারপাশের সমাজ থেকে সরিয়েও নেবে না, সেই সমাজের অংশ হিসেবে তার পরিচিতিও কেড়ে নেবে না বরং সেই সমাজের সাথে তাঁর এক অদ্ভুত সংযোগ ঘটিয়ে দেবে। তাঁকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাবে এই সাধনা, যার শ্রেষ্ঠ বর্ণনা কবীরের নিজের ভাষাতেই পাওয়া যায়; এমন এক জায়গা যেখানে সাধক নিজে 'বহূরী অকেলা'; অর্থাৎ, সবার সঙ্গেও রয়েছেন; আবার একলাও।

সব থোড় জমাত, হামারী জমাত,
সব থোড় পর মেলা,
হাম সব মহীন, সব হাম মহীন,
হাম হ্যায় বহূরী অকেলা।।

আমাদের দেশে গুরু-সংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা এবং সন্দেহের প্রেক্ষাপট থেকে এসেও আমি যে নিজের জন্য একজন গুরুর সন্ধান পেয়ে গেলাম, তাতে আমি নিজেই যথেষ্ট অবাক হয়েছিলাম। মালওয়ার গ্রামের স্কুলশিক্ষক এবং লোকসঙ্গীত গায়ক প্রহ্লাদজী নিজেকে কোনোদিনই 'গুরু' হিসেবে জাহির করেননি, সে কারণেই হয়তো আমাকে এত সহজে নিজের কাছে টেনে নিতে পেরেছিলেন। উনি প্রায়ই বলেন যে আমাদের সত্যিকারের গুরু সব সীমানার উর্দ্ধে, তাঁকে নিজের মধ্যেই পাওয়া যায়; আমাদের নিজের অভিজ্ঞতার বসতবাড়িতে তিনি আপনা থেকেই জেগে ওঠেন। আমাদের গুরু-সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যত উচ্চ-নীচ ভেদ, তোষামোদী আর জ্ঞানের রাজনীতি; সব কিছুকেই তিনি দূর করে দেন। তাঁর যেটুকু জ্ঞান, যেটুকু শিক্ষা তিনি হালকাভাবে, প্রায় খেলার ছলেই শিখিয়ে দেন। তাঁর এই শিক্ষাপদ্ধতির সাথে এক অবিচ্ছেদ্য বিনম্রতা জড়িয়ে থাকে — এই বিনম্রতাই আমায় বরাবর চিনিয়ে দেয় যে, মানুষটি একজন সত্যিকারের সাধক। আবারও আমি অবাক হই — এমন প্রাপ্তি তো আমি প্রত্যাশা করিনি।

আত্মপ্রত্যয় থেকে অজানা আর অনিশ্চয়ের দিকে যাত্রা — এই-ই আমার গল্প। এ তেমন অনিশ্চয় নয় যার বলে আমরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, দিশেহারা আর চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ি। বরং এই অনিশ্চয়ের জন্ম হয় আমাদের অস্তিত্বের রহস্য সম্পর্কে এক সহজ বোধ থেকে। আমাদের অন্তরের যে আধ্যাত্মিক সত্তা, যা আমরা নিজেরাই পুরোপুরি চিনে উঠতে পারিনি, যাঁকে কবীর বলছেন আমাদের 'আজব শহর', তাকে ঘিরেই যত অজানা আর অনিশ্চয়তা। সঠিক জবাব, স্পষ্ট আত্মপরিচয় এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য পথে নামতে গিয়ে আমি হারিয়ে গেলাম, নিজেকে হারিয়ে ফেলে পৌঁছে গেলাম 'না-জানার' এক আশ্চর্য দেশে। কবীর আমায় দেখিয়ে দিলেন সেই জগতে শান্তিতে থাকবার উপায়। তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং না-এর মাঝখানে কোথাও আমার সত্যিকারের গুরু বিরাজ করেন।

হাঁ কহুঁ তো হ্যায় নহী, না ভি কহিও নহী যায়,
হাঁ ঔর না কে বীচ মেঁ, মোরা সদগুরু রাহা সমায়ে।।

বহু বছর যাত্রা করে, এক অদ্ভুত উচ্ছ্বাস আর ক্ষুধা নিয়ে গানের পরে গান, কবিতার পরে কবিতা — প্রায় ৪০০ ঘন্টার ভিডিও সংগ্রহ করবার পর ফিল্ম সম্পাদনার কাজ শুরু করতে গিয়ে আমি টের পেলাম, অসম্ভব সংকেটে পড়ে গেছি। আমার এলোমেলো অভিজ্ঞতাগুলো আর ভিডিওগুলোকে সাজিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা শুরু করলাম, যদি কোনোভাবে একটা সুসঙ্গত গল্প খাড়া করা যায়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমার প্রথম প্রচেষ্টা ছিল গানগুলোকে ভাব অনুযায়ী ভাগ করা মৃত্যু, ভালোবাসা, আধ্যাত্মিক চেতনা, সামাজিক সমালোচনা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু অদ্ভুতভাবে লক্ষ করলাম, গানগুলোই স্বয়ং এরকম শ্রেণিবদ্ধকরণের কাজে বাধা দিচ্ছে। হয়তো একটা কোনো গান শুরু হল শ্রোতাকে প্রেমের নগরে আসার নিমন্ত্রণ জানিয়ে, অথচ তার পরের প্রতিটি স্তবকই মৃত্যুর কথা বলে গেল। আর একটি গান প্রথমে নিজের অন্তরের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা বলে, তারপরেই পণ্ডিত এবং মোল্লাদের হিংস্রতা এবং ভণ্ডামিকে ধিক্কার জানায়। এই প্রথম সচেতনভাবে বুঝতে শিখলাম কবীরের কাছে এই বিভিন্ন ব্যাপারগুলো কতটা গভীরভাবে, কতটা অবিচ্ছেদ্যভাবে একে অপরকে জড়িয়ে আছে। মানুষের অন্তরের সাথে বাইরের বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যে সংযোগ, সেটা বুঝতে বা চিনতে যে বোধশক্তি লাগে, সেই একই বোধশক্তি আমাদের চিনিয়ে দেয় সামাজিক বিভেদের অযৌক্তিকতা এবং অর্থহীনতাকে।

মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে তাকে চিনতে শেখা আসলে কিন্তু এক অন্যরকমের ভালোবাসাকে চিনেত শেখা।

কবীরের থেকে ভালোবাসার ব্যাপারে কোনো কঠিন শিক্ষা আশা করিনি, তাই একটা গান শুনে চমকে উঠেছিলাম মনে পড়ে। প্রথমবার শুনেছিলাম মালওয়াতে, পরে আবার রাজস্থানেও শুনি

ও মানে আবকে বাচাইলে মোরি মা, জামাইডো আয়ো লেয়ানে!

মা আমাকে বাঁচাও! তোমার জামাই এসেছে আমায় নিয়ে যাবে বলে। গানটা প্রথাগত বিয়ের আসরের গানের মতই শুরু হয়, কিন্তু একটু চলার পরে শব্দের খেলায় 'জামাই' হয়ে যায় 'যম'; মৃত্যুদূত। এই গানে আমরা বুঝতে পারি যে যখন সদ্যবিবাহিতা একটি মেয়েকে তার বর 'পীহার' বা বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে যাবে বলে আসে, তখন তার মনে যে ভয়টা জাগে, সেই একই ভয় আমাদের মনেও জাগে, যখন সারা জীবন ধরে অতি পরিচিত যত কিছু আঁকড়ে ধরে আমরা বেঁচেছি, সেই সব কিছু থেকে আমাদের সরিয়ে নিয়ে যেতে মৃত্যু এসে হাজির হয়। মৃত্যু মানে কেবল দেহের মৃত্যু নয়, তার সাথে আমাদের যাবতীয় সম্পর্ক, কাজ, বন্ধন, টাকা-পয়সার লেনদেন, স্বপ্ন, আদর্শ, আত্মপরিচয়, সব কিছুরই অবসান হয় মৃত্যুতে; এক কথায় বলা যায়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনগুলো যে অসংখ্য অস্থায়ী সত্তাকে ঘিরে থাকে, মৃত্যু হল তার অবসান।

প্রেমিকের সাথে মিলনকে (মাঝে মাঝে বিয়ের রাতের মিলনের কথা) কবীর এক করে দিয়েছেন মৃত্যুর মুহূর্তের সাথে। এই গানটা কিন্তু একই সঙ্গে আমার হৃদয় এবং আমার মস্তিষ্ককে নাড়া দিয়ে যাবে। কি হচ্ছে এই গানে? আমরা মৃত্যু বলতে ধরে নিই ভালোবাসাকে হারিয়ে ফেলা; এমন কিছু হারানো যা আমাদের কাছে মূল্যবান। কিন্তু কবীরের গানে মনে হয় মৃত্যু যেন ভালোবাসার দরজা খুলে দেয়, 'প্রেম নগরী' থেকে চলে যাওয়া নয়, সেখানে এসে হাজির হওয়া। হয়তো মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারলে (কেবল আমাদের শরীরের মৃত্যু নয়, আমাদের জীবন ঘিরে সমস্ত অস্থায়ীত্বের লক্ষণগুলো দেখে চিনতে পারলে) আমাদের সর্বব্যাপী 'পেয়ে হারানোর ভয়'টা কেটে যেতেও পারে; কেটে যেতে পারে আমাদের সবকিছু আঁকড়ে ধরে রেখে নিজেদের 'যেমন আছে, তেমনি থাকবে' প্রবোধ দেবার স্বভাবটাও। হয়তো এ ক্ষেত্রে মৃত্যু এনে দেবে স্বাধীনতা। তখন আমরা এক অদ্ভুত অসংযুক্ত, অবিরাম স্রোতের মতো ভালোবাসার সাক্ষাৎ পাবো

— যে ভালোবাসা আমাদের শৃঙ্খলে তো জড়াবেই না, বরং স্বাধীন করে দেবে। তখন হয়তো আমরা আর প্রেমে 'পড়বো' না, প্রেমে (জেগে) 'উঠবো'!

আমি কিন্তু আমার পার্থিব ভালোবাসা এবং নানা পিছুটানের স্রোতে ভেসেই চলেছি। তাদের আগমনকে আমি স্বাগত জানাই, তারা বিদায় নিলে আমি শোক করি। এই 'অব-গমন'-এর উত্তাল, কষ্টকর ওঠা-নামার মধ্যে, এই আসা-যাওয়ার মধ্যে, মিলন-বিচ্ছেদের এই অবিশ্রান্ত ঘূর্ণিতে ঘুরতে ঘুরতে আমি নিথরতা খুঁজে চলি। খুঁজে চলি গমন-আগমনবিহীন এক নিশ্চলতা, যেখানে 'চন্দ্র নেই, সূর্য নেই, মর্ত্য নেই, স্বর্গ নেই'..., চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে পথে নেমে এই শিক্ষা পাব, আমি কখনোই ভাবিনি।

হেলি, জিন ঘর উগে না আথমে,
ও হ্যায় মালিকজী রা দেশ, সাখীন সুন,
তুরিয়া পলানিয়া, রে হেলি
দিনদা চার কি রাহ, সাথীন সুন,
হেলি, যাও উতারো উন ঘরাঁ,
যা ঘর আওয়ে না যায়ে।।

কবীরের দোঁহাগুলো শ্রেণিবদ্ধতার বিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সমাজ জীবনকে নানা ভাগে ভাগ করে ফেলতে সফল হয়েছে, বেছে বেছে বিভিন্ন কবিতাকে নানাভাবে, নানা বিভাগের মধ্যে আত্মসাৎ করে ফেলেছে। (এর পিছনে সম্ভবত আছে আমাদের প্রথম লাইন শুনে বা কোনো একটি জোরালো বাক্যবন্ধ শুনেই তা দিয়ে গোটা গানের হিসেব করে ফেলা; একটা পুরো গান শুনে সম্পূর্ণ গানের বিচার করার ধৈর্য্য আর কারই বা আছে?)। প্রত্যাশিতভাবেই, ধর্মীয় আশ্রমে গুরু-বন্দনার গানগুলোই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। নাগরিক শ্রাদ্ধবাসরে মৃত্যু নিয়ে রচনা। সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সামাজিক আন্দোলন বেছে নেয় ধর্ম বা পুজো-আর্চা নিয়ে সমালোচনামূলক গানগুলো। হঠ-যোগ বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের গানগুলোকে তুলে ধরে নাগরিক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন। অতএব, বোঝাই যাচ্ছে প্রতিটি আলাদা গোষ্ঠী, যে যার নিজেদের স্বার্থ মতো, যার যার কবীরকে সাজিয়ে নেন।

আমাদের ফিল্ম এবং বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত কবীর ফেস্টিভ্যাল, যেখানে আমরা চলচ্চিত্র প্রদর্শন ছাড়াও গানের অনুষ্ঠান পরিবেশন করছি, এইসবই আমাদের কবীরকে খণ্ডিত না করে, এক সামগ্রিকতায় দেখবার সামান্য প্রয়াস।

বাস্তব জগতের নানা অসুবিধার থেকে কিছুক্ষণের জন্য সঙ্গীতের দুনিয়ায় পালানোর সুযোগ করে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। একাধিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত, বস্তুনির্ভর জগতের সাথে আধ্যাত্মিকতা এবং আত্মবিশ্লেষণের জটিল জগতের একটা মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করছি আমরা।

এই সত্যটা একবার উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম বলে মনে হয়, ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ব্যাঙ্গালোরের কবীর ফেস্টিভ্যাল। প্রসঙ্গটা ছিল, ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে মুম্বই শহরের সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের মাস চারেক পরে গোটা দেশের মানসিক পরিস্থিতি। বহু জায়গা থেকে সাহায্যের অভাব এবং চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও আমরা আমাদের পাকিস্তানি কবীর-শিল্পী বন্ধুদের জন্য ভিসার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম; যাতে তাঁরা মালওয়া, রাজস্থান, কচ্ছ এবং কর্ণাটক থেকে আসা শিল্পীদের সাথে এই অনুষ্ঠানে একত্রে অংশগ্রহণ করতে পা...। আমার ধারণা, এটা সম্ভব হয়েছিল কেবল আমাদের সংকল্পের দৃঢ়তা এবং মনের জোরে; আমরা ইতিহাসের ঠিক এই বিশেষ সময়টাতে দাঁড়িয়েই শপথ নিয়েছিলাম, যে এমন দিনেই আমরা দেশবিভাগের সীমানা ছাড়িয়ে কবীরের কথা, আমাদের পারস্পরিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দেব সবাইকে।

সেদিন উৎসবের শেষ দিন, করাচির ফরিদুদ্দিন আয়াজের কাওয়ালি গানের শেষ উপস্থাপনা দেখার জন্য ১৩৫০ লোকের প্রেক্ষাগৃহ কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। গায়ক যখন শুরু করলেন সেই বিখ্যাত রাজস্থানী লোকগীতি, 'পধারো মারে দেশ' (আমার দেশে এসো), এক অদ্ভুত বিরহবিজন মাধুর্যে ভরে উঠল চারদিন, থমকে গেল মুহূর্তটাও। গায়ক গাইলেন, 'চলো সেই অবিভক্ত দেশে যাই, ভারত-পাকিস্তান ছাড়িয়ে সেই আশ্চর্য দেশ, মনের ভিতরের সেই শ্রেণিবিহীন দেশ, সেখানে কবীর আমাদের ডাক পাঠাচ্ছেন।' শ্রোতাদের অনেকেই কাঁদতে শুরু করেছিলেন, মনে আছে।

এই অনুষ্ঠানে শুধু শিল্পীদের জন্যই আসন সংরক্ষিত করা হয়েছিল। মন্ত্রী-আমীর-ওমরাদের বা ভি.আই.পি.-দের নিয়ে কোনো হৈ-হুল্লোড় হয়নি, তাঁদের সম্বর্ধনা দেওয়ার হিড়িকও পড়েনি। বিনম্রভাবে, প্রায় সুফি-সুলভ আন্তরিক সহজতার সাথেই তাঁরা মানুষের ভিড়ে মিশে গিয়ে নিজেদের আসন খুঁজে নিয়েছিলেন। কোনো নিশানে বা বক্তৃতায় কোনো সংগঠনের বা গোষ্ঠীর তোষামোদ করা হয়নি। অনুষ্ঠানের জন্য যে স্বেচ্ছাসেবীরা কাজ করছিলেন, তাঁদের পরিশ্রম এবং নিষ্ঠাকে কোনো অংশেই অনুষ্ঠানের সাহায্যার্থে কয়েক লাখ টাকা দান করা কর্পোরেট সংস্থাগুলোর চেয়ে কম মূল্য দেওয়া হয়নি।

আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলিতে প্রায়ই নানান ধারার কবীর-শিল্পীকে একে অপরের সাথে হালকাভাবে রেষারেষি করতে দেখা যায়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞরা এখানে বাধ্য হন তাঁদের সুখী গৃহকোণের বাইরে বেরিয়ে এসে লোকগীতি এবং কাওয়ালি শুনতে। সুফি সঙ্গীতের 'রক' সুলভ উপস্থাপনা প্রত্যাশা করে আসা তরুণ শ্রোতাদের শুনতে হয় কবীরগীতির 'নির্গুণ ভজন'। যত আমাদের ফেস্টিভ্যাল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে থাকে (কর্ণাটকের শিশুনাল শরিফ থেকে নেপালের শশীধারা বা পঞ্জাবের গুরু নানক ... ইতিমধ্যে কবীর উৎসব দেশ-বিদেশের বহু স্থানে, নাগরিক ও গ্রামীন সমাজে অনুষ্ঠিত হয়েছে)। যত চলতে থাকে, ততই বিভিন্ন অচেনা ভাষার, অচেনা সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট থেকে আসা সাধক কবিদের কথা শোনা যায় এখানে। তাঁদের কথা মিশে যায় কবীরের কথার সঙ্গে, এক এক করে সমস্ত সীমারেখা মিলিয়ে যেতে থাকে।

কবীরের সঙ্গে আমর এই পথ চলার সূত্রে আমি খানিকটা বুঝতে শিখেছি কীভাবে আমাদের শরীরে, আমাদের অন্তরে প্রবেশ করবার পর কবীরের গানগুলোর অর্থ পাল্টে যায়। বুঝতে শিখেছি, কীভাবে অতিরিক্ত বিদ্যা ও তত্ত্বচর্চা কবীরকে জানা-বোঝার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। বহুবার এমন অনেক 'অশিক্ষিত' গ্রামের মানুষের সাথে আলাপ হয়েছে যাঁরা বাকপটু, অহঙ্কারে কাণা পণ্ডিতের থেকে অনেক ভালোভাবে কবীরকে চিনে ফেলেছেন তাঁদের নীরবতার মধ্য দিয়ে।

কবীর আমাদের এই জ্ঞান অর্জনের জন্য ডুব দিতেই শিখিয়েছেন, শিখিয়েছেন নির্মোহ হয়ে, নির্মম সততার সঙ্গে নিজের বিচার করতে। আমরা সবাই কিন্তু কুলের নিরাপত্তায় থাকতে ভালোবাসি, আত্মসংরক্ষণের স্বভাবে কেবল বুদ্ধিগত বিচার করে, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখাটাই আমার সহজ রাস্তা হিসেবে বেছে নিই। কিন্তু কবীর বলেন এক অন্যতর জ্ঞানলাভের কথা। লিখে-পড়ে বোঝা যায় না, তাকে দেখে বুঝতে হয়।

লিখা লিখী কি হ্যায় নহী, দেখা দেখী বাত,
দুলহা দুলহন মিল গয়ে, তো ফিকি পড়ি বারাত।

তাই সম্প্রতি যখন জানতে পারলাম যে 'ভক্তি' শব্দের একটি মূল অর্থ হল 'অংশগ্রহণ করা', খুব একটা অবাক হইনি। আমাদের গ্রামের লোকগীতি যে তার গণতান্ত্রিক এবং দলবদ্ধতার নীতির মধ্য দিয়েই 'ভক্ত' গোষ্ঠীর ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেটাও অপ্রত্যাশিত নয়। গ্রামের রাতভর 'সতসঙ্গ' এবং 'জাগরণ'

প্রথাগুলোর মাধ্যমেই কাব্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ও চর্চা হয়, সেখানে কতসব সীমানা পার করি আমরা — গায়ক এবং শ্রোতার সীমানা, গায়ক এবং গানের সীমানা, আত্ম এবং পরের সীমানা, নিজের এবং ঈশ্বরের সীমানা।

লালি মেরে লাল কি, জিত দেখুঁ তিত লাল,
লালি দেখাঁ ম্যায় গয়ী, ম্যায় ভি হো গয়ী লাল।

মানুষ আমায় জিজ্ঞেস করতে থাকে, আমি কবীরকে বেছে নিলাম কেন? উত্তর দিতে আমি হিমসিম খেয়ে যাই। সম্প্রতি এক সাংবাদিকের কবলে পড়ে এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলে ফেলি, 'আমি তো কবীরকে বেছে নিই নি, কবীর আমাকে বেছে নিয়েছেন!' প্রথমে নিজের এই জবাব নিয়ে একটু সঙ্কোচ হয়েছিল, তবে পরে ভেবে দেখলাম, খুব একটা ভুল যে বলেছি, তা নয়। 'আমিই কবীরের মনোনীত' হওয়ার অহঙ্কার থেকে এই উত্তর আসেনি, কবীরের স্নেহধন্য হবার বিনম্রতা থেকে; এমন এক উপহার পাওয়ার আনন্দে এসেছিল উত্তরটা।

চলচ্চিত্রের সম্পাদনা করবার সময় নিজের 'আমিত্বের' ভারে মাঝে মাঝে আটকে যেতাম, মনে পড়ে। 'মহৎ' চলচ্চিত্র বানানোর তাগিদে, একজন 'মহৎ' শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রত্যাশার ভারে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল। তেমন একটি মুহূর্তেই 'উপহার' শব্দটি আমাকে উদ্ধার করে দেয়। আমি আমার কাজকে চলচ্চিত্র নির্মাণ হিসেবে না দেখে আত্মানুসন্ধানের পূজায় আমার অর্ঘ্যদান হিসেবে দেখতে শুরু করলাম। বুঝতে শিখলাম যে উপহার উৎসর্গ করাবর ইচ্ছাটাই আসল, উপহারটা নয়। মন থেকে একটা বোঝা নেমে গেল।

সেই মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে এক অর্থে এগুলো 'আমার' চলচ্চিত্র হতেই পারে না। এগুলো আমার তৈরি নয়, আমার অর্জিত নয়, আমার মনোনীত নয়। এসবই উপহার হিসেবে পাওয়া আমার অভিজ্ঞতা; আমার ক্ষুদ্র পরিচিতি, ক্ষুদ্র দাবির অনেক উর্দ্ধের এক স্থান থেকে আমার কাছে এসেছে। একে অন্য কারো হাতে তুলে দেওয়া, অন্য কাউকে উপহার দেওয়া — এটুকুই আমার কাজ।

মেরা মুঝ মেঁ কুছ নহী,
জো কুছ হ্যায় সো তেরা,
তেরা তুঝ কো সৌঁপ দুঁ,
কেয়া লাগে হ্যায় মেরা?

শবনম ভিরমানি চলচ্চিত্র পরিচালক ও কবীর-শিল্পী। কবীরকে নিয়ে তাঁর এক দশকের বেশি সময় ধরে চলা, ফোর্ড ফাউন্ডেশন-সমর্থিত গবেষণা, 'দ্য কবীর প্রজেক্ট', ব্যাঙ্গালোরের সৃষ্টি স্কুল অফ ডিজাইনের অন্তর্গত একটি প্রকল্প। এই লেখাটি ২০০৮ সালে ' সেমিনার' পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধ, 'ওয়াকিং উইথ কবীর'-এর সম্পাদিত, অনূদিত সংস্করণ। অনুবাদক কবীর চট্টোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের স্নাতক তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। একই সঙ্গে বাংলা গানের লেখক-গায়ক ধারার তিনি অন্যতম উল্লেখযোগ্য নবীন শিল্পী।

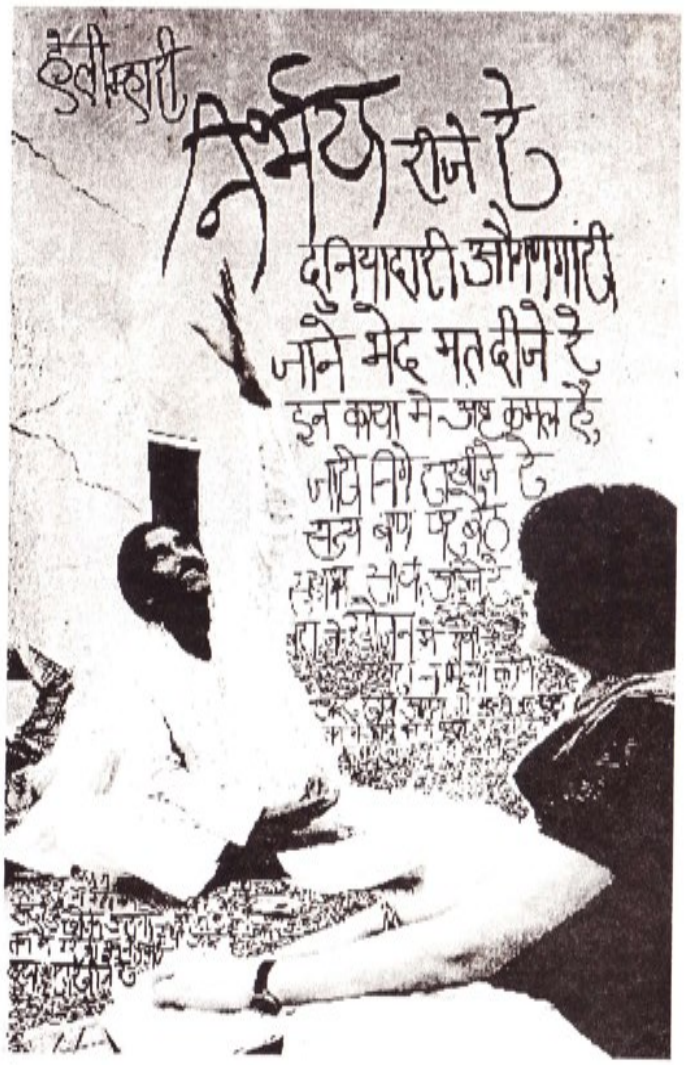

The Kabir Project
পোস্টার করেছেন স্মৃতি চানচানি।

শিলাইদহে কৃষক প্রজাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তোলা ছবি।
সৌজন্য : বিশ্ব ভারতী

লালন ভেড়োর দিন গিয়াছে?
একটি নাট্যকল্পে কুষ্টিয়া ও লালন

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

১

কী ভাবে করিবো মুর্শিদ
তোমারে বন্দনা?
কেমনে খুঁজিবে সাঁইজি
তোমারে রসনা?

এই প্রবন্ধের অনুচ্ছেদগুলির গোড়াতে একটি করে অনুল্লিখিত, অনাথ উদ্ধৃতি রয়েছে। স্তবকগুলি একটি বন্দনাগান থেকে নেওয়া। গানটি রচিত হয়েছিল একটি নাটকের নান্দী হিসেবে। নাটকটির নাম 'ম্যান অফ দা হার্ট'। শিরোনামটি রবীন্দ্রনাথের ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া হিবার্ট লেকচার থেকে নেওয়া। সেই বিখ্যাত বক্তৃতায় তিনি বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের দৈব-সন্ধানের অভিষ্ট, 'মনের মানুষ'কে পরিভাষঅয় পরিচিত করিয়েছিলেন 'ম্যান অফ দা হার্ট' নামে। 'This Man of the Heart is ever and anon lost in the turmoil of things. Whilst He is revealed within, no wordly pleasures can give satisfaction. Their sole anxiety is the finding of this man.' তবে নাটক 'ম্যান অফ দা হার্ট'-এর বিষয় কিন্তু কেবলমাত্র বাউল-ধর্ম বা বাউল-চর্যা নয়; এ নাটকের উদ্দেশ্য ছিল সেই মনের মানুষকে খুঁজে যিনি দীন ও হয়রান — অথচ, তিনিই একমাত্র মহাপুরুষ যিনি ছায়ায়-আবছায়ায় হয়তো বা পেয়েছিলেন মনের মানুষের কোনো ঝাপসা দর্শন — সেই লালন শাহ্ ফকিরের জীবন ও সময়কে, তাঁর মনের মানুষের সন্ধান-যাত্রাকে মঞ্চনাট্যের আরশিতে তুলে ধরার প্রয়াস। নিছক জীবনী-আখ্যানে বা ব্যাখ্যানে

নয়। চেয়েছিলাম নাটকের শরীর জুড়ে থাকবে অসম্পূর্ণ তথ্যে গড়া লালনের বহু বিতর্কিত 'জীবনী'র বিভিন্ন ভগ্ন-আখ্যান, যেমন পাওয়া, তেমন অবস্থাতেই। আর সেই দ্যোতক ও ভাঙা আখ্যানকে সতত ছুঁয়ে থাকবে তাঁর চর্যাপদী সন্ধ্যাভাষায় রচিত গানের অন্তঃস্পর্শ। থাকবে তাঁর বহুমাত্রিক ও বহুধার্মিক ভগবত-বিশ্বাসের নির্মিতির কথা, তাঁর নিগূঢ়-গুহ্য সাধন-তত্ত্বের ব্যাখ্যান। সমভিব্যাহারে আরও থাকবে তথ্য আর তত্ত্বকে ভিত্তি করে উঠে আসা মঞ্চছবি, তার চলমান চিত্ররূপ, তৎসহ কুষ্টিয়ার সুর-লয়-তাল। মোট কথা, ডকুমেন্টারী গবেষণা ও দৃশ্যকল্পের মেলবন্ধনে তৈরি এক নাট্য-প্রযোজনা। লালনের সার্বিক একটা চেহারা, যেখানে তাঁর জীবনের দীর্ঘ ও দ্বিধান্বিত, কালের আলম্বে উপনীত, অপিচ খণ্ডিত জীবনের গল্প ও গান, যাতে তত্ত্ব-তথ্য-কাহিনি সব মিলেমিশে প্রকাশিত হয় মঞ্চায়নের বাঙ্ময়তায়, বহুমাত্রিক ও অর্থময় গভীরতায়।

নাটকটির প্রথম মঞ্চায়ন হয়েছিল ২০০৫ সালে, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলীতে, তারপর বহুবার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে এই নাটক করেছি এবং এই সময়কাল ধরে নাটকের ভিতরে ও বাহিরে নানা বির্বতন ঘটে গেছে, যেমন বিবর্তিত হয়েছি আমি এবং আমার বন্ধু ও নাট্যদোসর সুমন মুখোপাধ্যায়, যাঁর নির্দেশনায় এই নাটক মঞ্চস্থ হয়। 'ম্যান অফ দ্য হার্টে'র প্রস্তুতি-পর্ব শুরু হয় সেই আশির দশকের শেষ ভাগ থেকে। প্রথমে তা ছিল মূলত বই-পড়া আর গান-শোনা কৌতূহল। আস্তে আস্তে সেটা দানা বাঁধলে পরে, খুলে গেল গবেষণার রাস্তা, নৃতত্ত্ব পড়তে গিয়ে। তখন আমি নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে পারফরমেন্স স্টাডিজের ছাত্র। ১৯৯২-৯৩ সাল নাগাদ কেনিয়ার বিখ্যাত লেখক-গবেষক ন'গুগি ওয়া থি'অঙ্গ আমাদের একটি ক্লাস পড়িয়েছিলেন 'মৌখিক সংস্কৃতি ও সাহিত্য'-র ওপর। সেই ক্লাসের জন্য আমি একটা পেপার লিখি, যার বিষয় ছিলেন লালন ও তাঁর ধাঁধা-গান। গবেষণার যাত্রা সেখান থেকেই শুরু। তারপর বছর কয়েক টাকা জমানোর পর, অবশেষে কুষ্টিয়া গমন। সুমন আর আমি, দুই বন্ধুতে সিদ্ধান্ত নিলাম, কুষ্টিয়া গিয়ে সরেজমিনে সব দেখে না আসলে আমাদের কাজের গোড়াতেই গলদ থেকে যাবে। শেষমেষ দুজনে গেলামও, যদিও অল্পদিনের জন্য। দেখা হল কালী নদী (যা ততদিনে স্রোতহীন দিঘিতে পরিণত), যেখানে মৃতপ্রায় লালনকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, লালনের মাজার (যেখানে একদা বাস করতেন তিনি স্বয়ং), তাঁর শেষনিদ্রার স্থান, বাইরেই শায়িতা তাঁর জীবন-সঙ্গিনী বিশোখা ফকিরানি, তাঁদের ইবাদত-বন্দেগীর ঘরের দরজা।

চিনলাম বহু বর্ষীয়ান ফকিরদের (যাঁদের অনেকেই এখন আর ইহজগতে নেই), আলাপ হল বহু সাধারণ মানুষের সাথেও, সারা জীবনের বন্ধুতাও তৈরি হয়ে গেল কারো কারো
সঙ্গে। দিনান্তের নিভন্ত আলোয় মাজারের দালানে গানের আসরে গান শুনলাম অনেক, অনেক না-জানা গান, অবাক করা গান, যা লালন রচনা করে গেছেন বলে জানতামও না ...। দেখলাম কুষ্টিয়ার ভূগোলের চেহারা, মফস্বল শহর, ভ্যান রিকশায় পাড়া-পার, নৌকোয় পারাপার, শীতের ধানক্ষেত, দেখলাম কাঙ্গাল হরিনাথের ভিটা, 'জমিদার-দর্পণ' ও 'বিষাদ-সিন্ধু' রচয়িতা মীর মোশারেফ হোসেনের আদি বাড়ি, ভরা-গাঙের গড়াই নদী, নৌকোতে গাঙ পেরিয়ে শিলাইদহ, ঠাকুর-বাড়ি, 'সোনার তরী'র সূর্যাস্ত ...। ভিডিওতে ছবি তুলে রাখলাম সব কিছুর, পুঙ্খানুপেুঙ্খ। পুঁজি হয়ে গেল সেই অল্প কয়েকটা দিনের কুষ্টিয়া সফর। এরপর নব-উদ্যমে আরও গভীর পড়াশোনা, আরও কয়েক বছর ধরে।

২০০৮-এ আমেরিকান ইন্সটিটিউট ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর বদান্যতায় সুযোগ ঘটল পুরো এক গ্রীষ্মের জন্য কুষ্টিয়ায় গিয়ে থাকার। ইতিমধ্যে নাটক মঞ্চায়ন হয়েছে আমেরিকান বিভিন্ন স্থানে এবং কলকাতায়ও। আবার কুষ্টিয়ায় গেলাম, সঙ্গে এলেন 'ম্যান অফ দা হার্ট'-এর তথ্যচিত্রকার, প্রোশত কালামী, যিনি মহড়ার একেবারে প্রথম দিন থেকে ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে একনিষ্ঠভাবে ছবি তুলে রেখেছেন নাটকটির হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত। কুষ্টিয়ায় দীর্ঘ মেয়াদে থাকতে পেরে জানতে পেলাম আরও, আরও অনেক কিছু। আরও অনেক ফকিরদের সঙ্গে মোলাকাত হল। জানলাম তথ্য আর তত্ত্বের মধ্যে ফারাক কতটা। নতুন তথ্য ও তত্ত্ব জানার মধ্যে দিয়ে এও জানলাম যে আমরা নিজেরা কত কম জানি। সম্যক করলাম যে ডিগ্রীর শিক্ষা, শিক্ষা নয়। জানলাম অসাম্প্রদায়িকতা কোনো গঠিত-পঠিত বিদ্যার মোটরবাইক নয়, তাকে জীবন-যাপন দিয়ে জানতে হয়, জোড়হস্তে দুই ধর্মের মাঝখানের ধূসর জমিনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, 'ওদের'-'আমাদের'-নাম্নী সেই ভয়ঙ্কর ভেদধর্মকে পর্যুদস্ত করতে হয় প্রশ্নবানে ...। জানলাম লালনের গান গাইবার অধিকার অর্জন করতে হয়, ঠিক যেমন ভেতরে ঢুকতে হয় রবি ঠাকুরের গানের।

এর ফলে আবারও যখন কলকাতায় এবং পরে লন্ডনে নাটকটি মঞ্চায়ন হল, অনুভব করলাম নাটকের ভেতরে, তার চরিত্রের গভীরে কোথাও, কি যেন একটা বদলেছে, বদলাচ্ছে। ২০১০ ও ১১তে আরো দু'বার ফিরে গেলাম কুষ্টিয়ায়। আরো জানলাম, বুঝলাম, দেখলাম। ২০১১-১২তে বার্লিনের মুক্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Interweaving Performance Cultures' ফেলোশিপের সুবাদে লালন-গবেষণার জন্য পেলাম অখণ্ড সময়। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার হল। এবার ইউরোপে মঞ্চস্থ হল লালনের গানের অনুষ্ঠান ও ভিডিও সহযোগে লেকচার — বার্লিন, উৎর্সবুর্গ, রোম, হেলসিংকি, কালাব্রিয়াতে। লালন-চিন্তা চলল গভীরতায় চোরা পথ ধরে, গভীরতর অঞ্চলে।

২

মুর্শিদ বুঝাইব কেমনে
তোমায় হইয়া মুরিদ?
জানে-মানে-গানের টানে
বুঝাইও সুহৃদ ...

লালন ফকিরকে আমরা সবাই চিনি, এইরকম একটা প্রতীতি বোধহয় আমাদের সকলের মনেই কাজ করে থাকে কম-বেশি। বিশেষ করে শহরাঞ্চলের, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষের মনে। বাংলার মাটির বড় কাছাকাছি এই মানুষটির গান আমাদের প্রাণকে ছুঁয়ে আছে বলে আমরা ভাবি। বাংলার মাটি, বাংলার (চোখের) জল, ছলছল ... প্রাণের কেন্দ্রে লতিয়ে ওঠে লালনের কিছু গানের (মানে দুই বা তিনটির) বাণী — যথা, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কিম্বা বাড়ির কাছে আরশিনগর — যার পুরো মানে না বুঝলেও, বুকের ভেতরে কি (বা কে) যেন একটা হু হু কর ওঠে! পাশাপাশি কাজ করে চলে লালনের জীবন-বৃত্তান্তের 'feel good' ব্যাপারটা, যে তিনি জন্মগত ভাবে ছিলেন হিন্দু কায়স্থ কিন্তু পরবর্তীতে হয়েছিলেন মুসলমান ফকির — কেমন যেন একটা কবীর-কবীর ভাব, কৃষ্ণের জন্ম-বৃত্তান্তের সাথে কিছু মিল পাওয়া যায়, মায় বাইবেলের মোজেস-সুলভ ইঙ্গিতও উপস্থিত! আর এই ব্যাপারটা তো আমাদের গণতন্ত্রের অসাম্প্রদায়িক ডিসকোর্সেরও একটা চরম সফলতার নিদর্শন, বিশেষ করে লালন নিজেই যখন বলে গেছেন,

সব লোকে কয় লালন কি জান সংসারে
লালন বলে জাতের কি রূপ
দেখলাম না এই নজরে ...

ফলত লালন আমাদের সবার ভীষণ প্রিয়, কারণ আমাদের প্রোগ্রেসিভ চেতনার লক্ষ্মণ-রেখা টানা চৌহদ্দির ভেতরে, symbol বা প্রতীক হিসেবে তাঁর

জবাব নেই, বিশেষ করে অসাম্প্রদায়িকতার চেতনায় আমাদের ঋদ্ধতর করার শ্রেণিবদ্ধ কোনো সুখকর ও আস্থাদায়ক ন্যাশানাল প্রজেক্টে।

অথচ তাঁর এই 'প্রতীক' সম্ভাবনাই কিন্তু লালনকে গোপনে আমাদের কাছ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। কারণ, লালন নিজে তথাকথিত বাঙালি শিক্ষিত মহলের লোক তো ছিলেনই না, তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করার কোনো দায়িত্বও তাঁর ওপর ন্যস্ত করা হয়নি। যদিও শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল বলে আমরা নিশ্চিত প্রমাণ পাই, যেমন ১৯ শতকের কুষ্টিয়া-নিবাসী সমাজ-সংস্কারক, লেখক ও 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকার সম্পাদক, কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার। তাঁকে আপনজন, বন্ধু বলে মানতেন লালন। এতটাই যে জনশ্রুতিতে শোনা যায় (হেমাঙ্গ বিশ্বাস জানিয়েছেন) যে একবার ঠাকুরবাড়ি থেকে আগত লাঠিয়ালদের হাত থেকে কাঙ্গাল হরিনাথকে বাঁচাতে, লালন নাকি তাঁর ফকির-বাহিনী নিয়ে হাজির হয়ে গেছিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও লালন নিজের সম্প্রদায়ের সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ফারাক ও দূরত্ব সম্বন্ধে ভালো মতোই অবগত ছিলেন। লালনের প্রথম জীবনীকার বসন্তকুমার পালের কলমে জানতে পাই, একবার নাকি হরিনাথ তাঁর লেখা বাউলাঙ্গের কিছু গান (হরিনাথ 'ফিকিরচাঁদ' ছদ্মনামে বাউল-ধর্মী গান লিখতেন, যার বিখ্যাত উদাহরণ হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যে হল ...) শুনিয়েছিলেন লালনকে। শুনে লালন বলেছিলেন, 'তোমার এ ব্যাঞ্জন বেশ হইয়াছে, তবে নুনে কিছু কম আছে।' অর্থাৎ নকল তো ভালোই হয়েছে, তবে আসলের সঙ্গে মূলের প্রভেদটুকু থেকেই গেছে। বসন্তকুমার লোকমুখে শুনে লিখেছিলেন বটে, কিন্তু এমনটা যে সত্যিই ঘটে থাকতে পারে, তার ইঙ্গিত লালনের বচনেই পাওয়া যায়। গতানুগতিক শিক্ষিত বাঙালির সঙ্গে তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের পার্থক্য দর্শিয়ে একটি গানে লালন, খুব সম্ভবত ফিকিরচাঁদ বা ওই ধরনের বাবু-বাউলের দলদেরই, ব্যঙ্গ করে বলেছেন —

যাত্রা দলে গিয়ে দেখি
বেশ পরে সব হয়রে যোগী
তেমনি মত জাল বৈরাগী
বাসায় গেলে কিছু নাই
আজগুবী বৈরাগ্য লীলা দেখতে পাই।।
এ সব হাত-বানানো চুল-দাড়ি-জট
কোন ভাবুকের ভাব রে ভাই?

অথচ, আশ্চর্য্যের কথা, সঙ্গীত-বাজারে লালনের গান আজকাল শোনা যায় এইরকম 'চুল-দাড়ি-জট'ওয়ালা 'ভাবুক'দের মুখেই বেশি। এঁরা আজ তো আছেনই, লালনের জীবদ্দশায়ও ছিলেন। তাঁদের দিকে তির্যক তীর তাক করে লালন আর একটি গানে প্রশ্ন করেছেন,

কেশে-বেশে বেশ করলে কি কয়,
রস-বোধ না যদি রয়?
রসবতী কে তারে কয়?
কেবল মুখে কাষ্ঠ হাসি।।

কুষ্টিয়ায় এক তরুণ ফকির, বলাই শাহ, একবার আমার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, 'লালন শাহের গান ডুগি-একতারায় হইত আগে। এখন কম্পিউটারেও হচ্ছে, ব্যান্ডেও হচ্ছে, সব জায়গায় হচ্ছে ...। হচ্ছে না? মানে, তার বৈশিষ্ট্য আর তারতম্য হারায়ে যাচ্ছে। মানে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। আপনে তো কিছুই বোঝলেন না, সোঝলেন না, আইসে, এখন পয়সার লোভে দুইখান গান শিখি, করি খাচ্ছেন। আদিতে তো এ হিসাব নয়, লক্ষ্মী! এটা তো এ দেশের হিসাব নয়। সংসারের কোনো যাতনায় তুমি থাকলে, ওর কাছে যাওয়া যাবে না। সোজা কথা শোনেন। যদি আসল তত্ত্বে আসেন, সংসার-যাতনা ছেইড়ি যাতি হবে। ছাইড়ি উর্ধে যাবার পরে গা ওই হিসাব-নিকাশে থাকতি হবে ...। বেরোনো যাবে নে।' অর্থাৎ, যাঁরা গতানুগতক সংসার-ধর্ম ছেড়ে গুরু ধ'রে লালন-পন্থায় সামিল হবেন, এবং সেই সাধনপথের অনুগামী হয়ে, সাধনার তাৎপর্য বুঝে, তার নিয়ম মেনে জীবন ধারণে ব্রতী হবেন, তার গুহ্যতা বজায় রাখবেন সসম্মানে, লালনের গানে অগ্রাধিকার কেবল তাঁদেরই। তাই যদি হয়, তাহলে কি যাঁরা লালনপন্থী সাধক, লালনের গানের ওপর একক ইজারা কেবল তাঁদেরই? লালন-ভক্ত কিন্তু সাধক নন যাঁরা, তাঁরা পারবেন না লালন গাইতে, লালন শুনতে, লালন ভাবতে? তা হয়তো নয় (কারণ মানুষের মুখে মুখে ফেরা গান সীমিত মেধাসত্ত্বের তোয়াক্কা করে না), তবে বলাই শাহ বোধহয় সেদিন ওই হুঁশিয়ারিটি দিয়েছিলেন লালনের গানের যথেচ্ছ অধিগ্রহণ ও মানে না বুঝে, তার মর্ম-ভেদ না করে তাকে স্রেফ পয়সা-রোজগার বা বিনোদনের বা কেরিয়ার তৈরির জন্য ব্যবহার করার চলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দাখিল করবার উদ্দেশ্যে। যাঁরা লালন-পন্থী সাধু-ফকির, তাঁরা লালনের গান ব্যান্ডে হচ্ছে না দোতারায় হচ্ছে, তা নিয়ে বিশেষ ভাবিত নন, কারণ তাঁদের স্বীয় স্বীয় সাধন-ব্রতে তাঁরা স্থিতপ্রজ্ঞ। তবু, তার বাইরে একটা

নৈতিক প্রশ্ন থেকেই যায় ...। লালনের গান তাহলে কার?

কুষ্টিয়ার আর এক বর্ষীয়ান ফকিরের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। ১০৭ বছর বয়সী এক ফকির, নাম বাদের শাহ (নামান্তরে আব্দুল গনি শাহ)। তাঁকে দেখি ২০০৮ সালে, তিনি দেহ রাখার ৬ মাস আগে। শীর্ণকায়, দৃষ্টিহীন ও চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধ, মৃতপ্রায় পড়ে আছেন লালনের আখড়া-মাজারের বাইরে, অনতিদূরে একটি টিনের চালাঘরের তলায়, চিটে-ধরা মাদুরের শয্যায়। ২০০৮-এ তাঁর বয়স যদি ১০৭ হয়ে থাকে, তাহলে সেই হিসেবে তাঁর জন্ম ১৮৯০ সালে লালন শাহের মৃত্যুর মোটামুটি ১ দশকের মধ্যে। তার মানে বাদের শাহ-র যখন জ্ঞান হয়েছে, তখন তিনি নিশ্চয় লালন-শিষ্যদের প্রত্যক্ষ করেছেন। বাদের শাহ-র কথা জানার পর, প্রবল উৎসাহে ওঁর কাছে যাই। প্রথম বাক্যালাপে উনি আমাকে লালন সম্বন্ধে সকলে যা জানে, তার বাইরে বিশেষ কিছুই বললেন না। আমার জানার ও বোঝার ইচ্ছা যে বেশ আর একটু গভীর, সেটা বলাতে বৃদ্ধ খানিক উষ্মা-সহযোগে বললেন, 'এত সব ভাঙ্গাভাঙ্গি, বোঝাবুঝি, ছাইড়ে দ্যাও ব্যাটা। ... সব কথা ওই সুরের ভিতরি। আগে সেই সুর শেখেন গে।' অন্যত্র বাদের শাহ আমাকে এও বলেছিলেন যে লালনের গান হল কোরআন ও হাদিস-তুল্য; অতএব, ওই গানগুলিকে উল্টেপাল্টে বিচার করলে, এফোঁড়-ওফোঁড় করে বিশ্লেষণ করলেই ফকিরির পথ-নির্দেশ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু গানের মানে তো আর আপনা-আপনি বোঝা যাবে না, তার জন্য লাগবে শিক্ষক। আর সেই পথে অগ্রসর হতে গেলে, বাদের শাহ উপদেশ দিলেন গুরু ধরতে হবে। 'গুরু ছাড়া এর সমাধান কেউ করতি পারবে? শুধু ঘুইরে বেড়ালেই হবে? ... লালন শাহ-র কথা ধইরে নেয়া এত সহজ না। ... আমার জীবনটা গেল, ঘর-বাড়ি ত্যাগ করি, এই করতি করতি। আর আপনারা এক কথায় বলেন, 'দেন আমায় ওই কথা।' ব্যবসা তো এইই হয় দেখতিছি।' অনেক বোঝানো-সোঝানোর পর — যে ব্যবসা নয়, জ্ঞান সঞ্চয়নই আমাদের অভীষ্ট — বাদের শাহ নরম হলেন। কিন্তু কথার তেমন নড়চড় হল না; গুরু না ধরলে, পথে না নামলে, তরিকা-ভুক্ত না হলে, লালনের কোনো কিছুই জানা যাবে না। কারণ এ তত্ত্ব জানতে গেলে, অভীষ্ট সেই অধর-চাঁদকে পেতে হলে, লালন বলেছেন 'অধরে অধর দিয়ে' ছুঁতে হবে তাকে। শরীরী ব্যাপার। আর তা সিদ্ধ করতে হবে এ বাহ্য বর্তমানে — মানুষে মনস্কামনা সিদ্ধ করো বর্তমানে — ভাসা ভাসা ভাবনার অনুমানে এ হবার নয়। অর্থাৎ, এ জিনিস 'ধরি-মাছ, না-ছুঁই পানি' করে পাওয়া সম্ভব নয়।

দুগ্ধে-জলে মিশাইলে
বেছে খায় রাজ-হংস হইলে
কারো সাধ যদি যায় সাধন বলে
হয় সে হংসরাজের ন্যায় ...

হতে হবে পঙ্ক-মাঝে পদ্মবৎ হংস! সে কি চারটি-খানি কথা?

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মেহেরপুরের অধিবাসী ফকির দৌলত শাহ-কে জিজ্ঞেস্ করেছিলাম এই গুরু-শিষ্য বা মুর্শিদ-মুরিদের সম্পর্কের বিষয়ে, 'গুরুর যে সন্ধান মুরিদ করবে, মুরিদ যে মুরশিদকে খুঁজবে, কোন মুর্শিদ কোন মুরিদের উপযুক্ত, বা কোন মুরিদ কোন মুর্শিদের উপযুক্ত, এই নির্বাচনটা কী ভাবে হয়? এই নিরূপণটা কে করে দেয়?' জবাবে সত্তরোর্ধ দৌলত শাহ বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'এটা জ্ঞানের পরিমাপ। ... এর জন্যই আগে জ্ঞান সঞ্চয় প্রয়োজন। জ্ঞান ছাড়া গুরু ধরা যাবে না। শতজনের কাছেও যদি আমি যাই, আমার ভিতরে যদি সেই জ্ঞান বা সেই লক্ষ্য না আসে, তা হইলে এটা হইতি পাইরবে না। ... জ্ঞানের স্তর-বাই-স্তর উর্ধে উইঠটি হবে। তার কারণ জ্ঞান এমন একটা জিনিস, একে সঞ্চয় কইরলিই, ওই জ্ঞানের মাইধ্যমেই গুরুকে পাওয়া যাবে।' এর কিছু পরেই, বোধহয় আমাদের কথোপকথনের জের ধরেই, দৌলত শাহ শোনালেন লালন শাহ-র গান —

আমার জন্ম-অন্ধ জ্ঞান-নয়ন
গুরু তুমি বিজ্ঞ-সচেতন
অতি বিনয় করে কয় লালন,
'জ্ঞান-অঞ্জন দাও মোর নয়নে'।।

এই জ্ঞান সঞ্চয় তাহলে কী? কেমনে পরব, পরাবো নয়নে এই জ্ঞানের সুরমা? কী ভাবেই বা করব এই গঞ্জু-ভাণ্ডারের অযুত-রতন সন্ধান ও সঞ্চয়ন? এইখানে এসেই বোধহয় শহর-গ্রাম, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বাবু-বাউল, বড়লোক-ছোটোলোক, ধনী-গরীব বা এমনতর আরো binary বা যুগ্ম-বন্ধের বিশ্লেষণ ভেঙে পড়ে। লালনের কথা লালনেরই দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথের 'অন্ধজনে দেহ আলো', বা জন মিল্টনের ভাষায় 'What is dark in me illumine' (যা আছে আমাতে আঁধার, কর উজ্জ্বল), অপিচ ঋগ্বেদের 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' (আঁধার হতে আলোর পথে নাও ...) বা মৌলবী

জালালউদ্দীন রুমির কথা ধরে 'তাবেশ-এ-জান ইয়াফত দোল-আম ...' (হৃদয় আমায় পেয়েছে খুঁজে প্রাণের আলোকটিকে ...)।

৩

বৃত্তি-জীবি, বুদ্ধি-জীবি
আছি যতেক মোরা,
আছি যতেক যবন-কাফের
শরা ও বেশরা ...
(মুর্শিদ) নশ্বর ও ঈশ্বরা।।
আছি যতেক নগরবাসী
দেশে ও বিদেশে,
কোন সাধনে সাজি মোরা
আশেকের বেশে।।

ইংরেজি মতে লালন ফকিরের ইন্তেকাল হয়েছিল ১৭ই অক্টোবর, ১৮৯০ সালে, অর্থাৎ বাংলা মতে ১লা কার্তিক, ১২৯৭। স্থান কুষ্টিয়ার পার্শ্ববর্তী গ্রাম, ছেঁউড়িয়া। ওই সময়ের পর থেকেই ছেঁউড়িয়াতে লালনের তিরোধান দিবস পালিত হয়ে এসেছে সাধু-ফকিরের সমাগমে। পাশাপাশি একটু ছোটো আকারে সংগঠিত হয়েছে আর একটি সাধুসঙ্গ অনুষ্ঠান, দোল পূর্ণিমা তিথিতে। বহুদিন পর্যন্ত এ ছিল শুধু ফকির-মানুষদেরই ব্যাপার। বছরের ওই দুই সময়ে তাঁদের সাঁইজীর সম্মানার্থে তাঁরাই এখানে সমবেত হতেন এবং ফকিরি চিন্তায় মৃত্যু যেহেতু কেবলই শোকের কারণ নয়, তাঁর শেখানো পথের আবহে সাধুসঙ্গ করতেন, গান ও তত্ত্বকথার সমন্বয়ে। এভাবেই চলছিল। তারপর ১৯৬৩তে তৈরি হল লালন লোক সাহিত্য কেন্দ্র, কিন্তু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অবজ্ঞায় তা এক নামমাত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল অচিরেই। বছর ১৫ পরে ১৯৭৮-এ প্রতিষ্ঠিত হল লালন একাডেমি।

সেই সময়ের পর থেকেই ১লা কার্তিক (ও তার সাথে দোল পূর্ণিমার অপর অনুষ্ঠানেও) একাডেমি ধীরে ধীরে জড়িত হয়ে পড়ে। আর অন্যদিকে লালন ফকিরের খাতির বাড়ন্ত পরিমাপ অনুসারে আয়তনে বাড়তে থাকে অনুষ্ঠান। ক্রমে অনুষ্ঠান পরিরত হয় মেলায় ও লালনগীতি পরিবেশনার প্ল্যাটফর্মে। সাধু-সঙ্গ, তত্ত্ব-আলাপ, পালা-গান এ সব হয়ে পড়ে গৌন। পাশাপাশি পাকা হয়ে ওঠে

লালন একাডেমির প্রাতিষ্ঠানিকতা, বিশেষ করে ২০০৪ সালে লালন শাহের মাজার-আঙ্গিনায় যখন (নানাজনের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও) বাংলাদেশের তৎকালীন চত্বত্ব সরকার, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে নির্মাণ করেন লালন একাডেমির পাকা বাড়ি। সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মিত এই একাডেমি বিল্ডিংয়ের ভেতরে আছে ৫০০ আসনের প্রেক্ষাগৃহ, রক্ষণালয় (মিউজিয়াম), পাঠাগার, ক্লাসরুম ও সচিবালয়। সরকারি ও বেসরকারি টাকা, ধনী-ব্যক্তি ও নানান বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায়, পাশাপাশি রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশাল অনুদানে পুষ্ট লালন একাডেমি এখন এক বিরাট বিজনেস ভেনচার। এককালের ছোট্টো গ্রাম ছেঁউড়িয়া এখন পরিণত হয়েছে 'টুরিস্ট স্পট'-এ। সারা বছর ধরে চলছে জনসমাগম। মিলিটারী ক্যাডেট আর ইস্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী থেকে আরম্ভ করে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমন-নির্ঘন্টে ঢুকে পড়েছে লালনের নাম। আখড়া পরিণত হয়েছে তীর্থযাত্রীর থীম-পার্কে, 'মিকি-মাউস' মাজারে।

এতটাই যে বহু ফকির আজ আর তাঁদের সাঁইজীর মাজারে প্রবেশ করতে পারেন না, একাডেমির বকলম নির্দেশে বা সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপে (শতবর্ষীয়ান বাদের শাহ ছিলেন সে রকমই একজন ব্রাত্য ফকির)। ২০১২তে প্রয়াত, ফকির আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহ-র নেতৃত্বে এ নিয়ে মামলা দায়েরও করেছিলেন 'লালন মাজার ও সেবাসদন রক্ষা কমিটি'। জবাবে বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছিলেন যে ১৮৯০ সাল থেকে যেহেতু ফকিররাই লালনের প্রতিষ্ঠিত আখড়া ও মাজারের দেখভাল করেছেন, এ পুণ্যস্থানের মালিকানাও তাঁদেরই। তা সত্ত্বেও, কিছু পদ্ধতিগত সমস্যায় আইনের ফাঁক তৈরি হওয়ায়, লালন একাডেমির নিয়ন্ত্রণ ফকিরদের হাতে গেল না। বদলে প্রতিষ্ঠিত হল এক নির্বাচিত কমিটি, যার সবাই বাংলাদেশের ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলগুলির পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন-ধন্য। এই কমিটির নির্বাচন আপাতদৃষ্টিতে 'গণতান্ত্রিক'। আপাতদৃষ্টিতেই, কারণ প্রত্যেক প্রার্থীকে কয়েক লক্ষ টাকার আমানত দিয়ে নির্বাচনে দাঁড়াতে হয়, যা কিনা কোনো ফকির-মানুষের পক্ষে দেওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়। ফলত, সাধু ও সাধক ফকিরদের বাদ দিয়েই চলছিল লালন একাডেমি। চলছিল কেবল তাদের স্বার্থে, যাদের কাছে লালন নামটি একটি 'ব্র্যান্ড' ছাড়া আর কিছুই নয়। সোজা কথায়, লক্ষ-কোটি টাকা উপার্জনের এ এক অতীব সুগম রাস্তা। বস্তুতই, লালন এখানে অনুপস্থিত। ২০১০-এর লালন মেলায় লোগো হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে নন্দলাল বসুর আঁকা একটি স্কেচ, যা নাকি

লালন ফকিরের প্রতিকৃতি, মানে নন্দলাল নাকি লালনকে দেখে এ ছবি এঁকেছিলেন। অথচ লালন যখন মারা যান, নন্দলালের বয়স তখন ছয়। অর্থাৎ, এ লালন মেলায়, লালন থেকেও নেই; তিনি এক অদৃশ্য উপস্থিতি! এ পরিস্থিতির কিছু বাহ্যিক বদল ঘটল ২০১১তে। যখন, দুর্নীতির কেচ্ছায় কবলিত হওয়ার পরে, নির্বাহী কমিটির নির্বাচন বাতিল করে বাংলাদেশ সরকার লালন একাডেমির নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নিল নিজেদের হাতে।

কুষ্টিয়ার বর্ষীয়ান ফকির ও লালন গীতির সর্ব-প্রধান exponent, প্রায় ৯০ ছোঁয়া ফকির আবদুল করিম শাহ (ইনি শ্রীহট্টের প্রয়াত শাহ আবদুল করিম নন) উপর্যুক্ত সমস্ত তথ্যের সমর্থনে আরও জানালেন যে লালন একাডেমি থেকে তিনি কোনোদিন এক পয়সাও পাননি, অথচ তাঁর কাছে খবর আছে যে তাঁর নামে সরকারি ও বেসরকারি নিয়মিত অনুদান এসে চলেছে লালন একাডেমির ভাণ্ডে। প্রশ্ন হল, সে পয়সা তাহলে কোথায় গেছে? দেওয়াল-বিহীন এক চালার তলায় আশ্রিত করিম শাহের হতমান দারিদ্র্য আমার নিজের চোখে দেখে আসা, অতএব এর বিরুদ্ধ-পক্ষীয় কোনো যুক্তি আমার কাছে অন্তত কষ্টকল্পিত। ২০০৮ সালে এমন হতমান দারিদ্র্যে পড়ে থাকতে দেখেছি বাদের শাহকেও। যাঁর কনক্রিটের পাকা কবরস্থান আজ তাঁর জীবদ্দশার বাসস্থানের চাইতে ঢের বেশি বাসযোগ্য।

সরকারের অধিগ্রহনের পরেও অবস্থা কি খুব বদলেছে? লালন মেলার শিল্পীরা কারা? মেলায় যাঁরা আসছেন, ৫ রাত্রি-ব্যাপী অনুষ্ঠানে তাঁরা কাদের গান শুনছেন? আর যেই ফোন কোম্পানী এই মেলার স্পন্সর? তাঁদের কাছেই বা লালন কে? লালন কেন? এই শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করার দায় কেনই বা পড়েছে তাঁদের ঘাড়ে, শিল্পীরাই বা এঁদের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেছেন কেন? এই শিল্পীদের গানের পৃষ্ঠপোষকতা করে কাদের কী লাভ? অথচ গভীর খেদের কথা, এই সব শিল্পীদের বেশির ভাগই লালন শাহের গান গাইবার যোগ্যতা দূরে থাক, সুরে গান গাইবার ক্ষমতাও রাখেন না। কিন্তু মজার কথা, এঁদের অনেকেরই ক্যাসেট ও সিডি-বন্দি অ্যালবাম দেখি মেলায় ও লালনের মাজারের পাশের দোকানগুলিতে বিক্রি হচ্ছে সুলভে (লোকে কিনছেও!), ঠিক যেমন বিক্রি হচ্ছে টি-শার্ট, নানান সাইজের এক-তারা, ডুগি-তবলা, খমক ও লালনের নামাঙ্কিত শান্তিনিকেতনি ঝোলা, লিভিং রুমের দেওয়ালে ঝোলানোর ছবি, কফি টেবিলে রাখবার জন্য লালনের কল্পিত মূর্তি, এরই মাঝে আবার দেখি ইসলামী প্রার্থনার কেতাব বিক্রি করছেন কেউ, বা মেলার এক আলো-আঁধারি কোণে পাওয়া যাচ্ছে গঞ্জিকা, চরস বা আরও 'হার্ড' কিছু ...।

শুধু তাই নয়, মঞ্চে ওঠা এইসব শিল্পীদের অনেকেই কিন্তু শিশু-শিল্পী যারা লালনের গানের দেহতাত্ত্বিক মানে না জেনেই গেয়ে চলেছেন গান। তবে সবাই শিশু নয়। প্রাপ্ত-বয়স্ক অনেকেই, আর তাঁদের অনেকেরই গায়ে ফকিরের বসন, যদিও মনের কেন্দ্রে ফিকিরি বৈ নেই আর কিছুই। ফিরে আসতেই হয় লালনের সেই প্রশ্নে — এ সব হাত-বানানো চুল-দাড়ি-জট, কোন ভাবুকের ভাব রে ভাই? অথচ এঁদের মধ্যে দেখি কিছু চেনা মুখও, যাঁদেরকে আগে দেখেছি সাঁইজীর প্রতি ভক্তিতে অটল। হয়তো ওই যৎসামান্য পয়সার টানেই তাঁদের উঠতে হয়েছে লালন একাডেমির মঞ্চে। চিন্তার উদয় হয় — এ কি তাহলে এই লোকজ-ধারার, লালনের ঐতিহ্যের প্রতিরক্ষা হল? অথচ বাউল ঐতিহ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের ইউনেস্কো (UNESCO) সংগঠন দ্বারা Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguard বলে চিহ্নিত হয়েছিল, ২০০৮ থেকে ২০১০, এই দুই বছর মেয়াদে। এবং লালন একাডেমির হোতা সংগঠন শিল্পকলা আকাডেমি তার জন্য পেয়েছিলেন মোটা অঙ্কের অনুদান। ইউনেস্কোর বিবৃতি অনুসারে, 'the project concentrates on the Baul community from the Kushtia region where a great Baul Guru of Bengal, Lalon Shah, lived and created a tradition of intergenerational transmission of Baul songs. [...] The organization of Baul Melas (fairs) will raise awareness among the general public of the Baul heritage and of the importance of supporting its bearers.' কিন্তু সত্যিই কি তাই হয়েছে? মূল ফকিররাই যখন বাদ, তখন হেরিটেজের আর বাকি থাকল কি? আর জেনারেল পাবলিকই বা তার মর্ম বুঝবে কি? কাজ ও কর্মের এমন ফারাকের দায় কার?

২০১০-এ চর্মচক্ষে দেখেছি মেলার প্রধান মঞ্চের সামনে প্রহরারত বন্দুকধারী সেপাই জনা কতক, সঙ্গে মিডিয়া কোম্পানির হেড-ব্যান্ড পরিহিত ভলেনটিয়ার তরুণদল। মঞ্চে ভেকধারী শিল্পীরা গাইছেন, তাদের সামনে মাথায় চোঙ্গা-পরা কিম্ভূৎকিমাকার দেখতে এক বৃদ্ধ, সং সেজে, একতারা হাতে নেচে চলেছেন প্রচণ্ড ফূর্তিতে। এদিকে একাডেমির সম্পাদক নিজেই শিল্পীদের নাম ঘোষণা করছেন, দর্শকদের অনুরোধ করছেন করতালি দিতে, আবার গানের ফাঁকে ফাঁকে শিল্পীদের কারো কারো হাতে খুশী হয়ে, সামন্ততান্ত্রিক বদান্যতায় তুলে দিচ্ছেন ১০০ কি ২০০ টাকার নামমাত্র পুরস্কার। ওদিকে মঞ্চের সামনে সংরক্ষিত আসনে বসে আছেন সান্ত্রী-মন্ত্রী-ষড়যন্ত্রী, আঙ্কেল-মঙ্কেল, ডাক্তার-মোক্তারেরা। কেউ বা স্থানীয়, কেউ বা বহু কষ্ট করে, অমূল্য সময় ব্যয় করে ছুটে এসেছেন রাজধানী

থেকে। সংগীতানুষ্ঠানের গোড়ায় তাঁদের হাতে জনাব-সম্পাদক কখনো তুলে দিচ্ছেন বাহারী কল্কা-করা একতারা, কখনো বা মানপত্র। বৈদ্যুতিন-রেখার তীক্ষ্ণ আলোকপাতে ডিজিটাল ছবি তোলা হয়ে যাচ্ছে ফটাফট, টাটকা টিভি ক্যামেরা সব দেখে যাচ্ছে লাইভ! গন্য-মান্য ব্যক্তি ব'লে কথা! এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ দেখতে পাই (অবাক যাই হেরে!) নামজাদা লালন গবেষকও! ইচ্ছে করে জোরে বলে উঠি, 'ও চৌধুরী-সাহেব, ও মনির-ভাই! আপনারা এদের মধ্যে করছেন কি?'বলতে পারি না সামাজিকতার লজ্জায় ...। ঠিক এই সময় মঞ্চে কেউ একজন গেয়ে উঠলেন লালনের একটি বিশেষ জমাটি জনপ্রিয় গান, হয়তো তার ব্যাঙ্গময় তির্যকতার তাৎপর্য কিছু না বুঝেই —

বেদ-বিধির পর শাস্ত্র-কানা, আর এক কানা মন আমার
এসব দেখি কানার হাট-বাজার।।
এক কানা কয় আরেক কানারে
চল এবার ভব-পারে।
নিজেই কানা পথ চেনে না
পরকে ডাকে বারংবার।।

এমন তো হবারই ছিল। এমন তো হয়েই থাকে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা তো এভাবেই গিলে ফেলে থাকে নিম্নবর্গের মার্জিনস্থিত সংস্কৃতিকে। পিষে শেষ করে করে বা গিলে খেয়ে ফেলতে না পারলে, তাকে মাথায় তোলে; সেও তো মানুষের থেকে দূরে নিয়ে যাওয়াই হল! এ তো কো-অপশনের কালসিদ্ধ এক ক্লাসিক পন্থা! ২০১২-তেও ফকিরদের মুখে শুনি অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। লালন মেলা কর্পোরেট থেকে কর্পোরেটেতর হয়েই চলেছে...

তা তো বুঝলাম, কিন্তু ২০১০-এ দ্বিতীয়বার হোঁচট খেতে হয়েছিল, যখন দেখলাম ফকির মন্টু শাহ-র 'লালন মাজার ও সেবাসদন রক্ষা কমিটি' আয়োজিত প্যারালেল অনুষ্ঠানেও ঢুকে পড়েছে বেনো-জল। এই অনুষ্ঠানও দেখি এক মিডিয়া কোম্পানীর স্পন্সরশিপের টাকার সংগঠিত হয়েছে! করিম শাহের অনবদ্য উদ্বোধনী গানের পর যখন কাক-কণ্ঠে গান ধরছেন টেরি-কাটা, বাবরিওয়ালা কোনো বেয়াদব বেসুর গায়ক, অথবা জর্জেট-শাড়ি ও উগ্র মেকআপে সজ্জিতা কোনো অযোগ্য গায়িকা। অথবা মাইকের সামনে পালা করে আসছেন স্থানীয় কর্পোরেশনের কোনো হর্তা-কর্তা-বিধাতা, বা বড়লোক-মহাজন কেউকেটা, বা

(হায়রে) আবার কোনো উচ্চ-বর্গীয় লালন-গবেষক। তাঁদের দিকে ফোকাস করা আছে বনবন করে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রিক পাখা, আর ওদিকে এক কোনে, কমিটির কাছে থেকে পাওয়া ৫০ টাকায় একটিমাত্র নোট হাতে, গরমে গলদঘর্ম হয়ে চরম অবহেলায় বসে বসে হাঁপানির হাপর টানছেন করিম শাহ ... অথচ, এই তো, একটু আগেই তিনি গাইছিলেন —

এলাহী আলামিন গো আল্লাহ্ বাদশাহ্ আলমপনা তুমি...
তুমি ডুবায়ে ভাসাইতে পারো, ভাসায়ে কিনার দাও কারো
রাখো মারো, হাত তোমারও, তাইতে দয়াল ডাকি আমি।।

দয়ালের কি ক্ষমতা আছে এ হেন বিকৃতির কিনার দেওয়ার? এই কথাই মাগুরা গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম হিন্দু-বংশোদ্ভুত লালন-পন্থী ফকির ও স্বশিক্ষিত কবিরাজ মনোরঞ্জন গোঁসাই, ওরফে মনোরঞ্জন বসুকে। তাঁর ধারণা লালনের ভক্তি ও সাধন পন্থা 'অতি শীঘ্রই লুপ্ত হবে। এ যুগের প্রতারকদের হাতে মরবে সব। থেকে যাবে শুধু তাঁর গান।'

তাই কি? এতটাই হতাশা-ব্যাঞ্জক অবস্থা? লালনও তো তাঁর জীবদ্দশায় শুনিয়েছিলেন হতাশার বাণী —

কলিতে অমানুষের জোর, ভালো মানুষ বানায় চোর।
সমঝে ভবে না চলিলে বোম্বেটের হাতে পড়বে ভাই।।

মা মরা বাপ বদলানো স্বভাব, কলির যুগে দেখি এ ভাব।
লালন বলে কলিকালে ধর্ম রাখার কী উপায়।।

তবুও, কলিকালের এ প্রান্ত সীমায় দাঁড়িয়েও তো বাকি রয়েছে ধর্ম ভাব। লালনের হতাশার পরেও তো নয় নয় করে কেটে গেল ১০০ বছরেরও বেশি সময়। নেই নেই করেও, আছে তো কিছু বাকি। নইলে এতৎসত্ত্বেও কেমনে সাধন-ভজন করছেন মনোরঞ্জন গোঁসাই, করিম শাহ, দৌলত শাহেরা? আর আমরা যারা বাইরে থেকে দেখছি, নদীর ধারে বসে স্রোতের লীলা দেখছি আরাম কেদারায়, আমাদের শেখার যেমন আছে, দেবারও কি কিছুই নেই? বিরূপ স্রোতকে উল্টে দেবার মতো সুপরিকল্পিত কোনো ফন্দি?

সে রকম সুফন্দি থাকলেও তাকে কার্যত প্রয়োগ করা বোধহয় সহজ হবে না, অন্তত কুষ্টিয়াতে তো নয়। কারণ বোঝাই যাচ্ছে লালন আর কুষ্টিয়াতে থাকেন না, সেখানে আছে শুধু তাঁর কবর। একটি সিম্বল। লালনের কাজের চেয়ে,

দর্শনের চেয়ে, গানের গভীরে যাওয়ার প্রয়াসের চেয়ে, আজও বেশির ভাগ মানুষের ঢের বেশি কৌতূহল ও জল্পনা-কল্পনা লালনের পরিচয় নিয়ে। ২০১১ সালে লালন একাডেমির এক প্রাক্তন বোর্ড মেম্বার তো আমাকে বলেই বসলেন, '১৮ শতকে কুষ্টিয়ার কাছে কোনো এক নদীতে এক ব্রিটিশ স্টিমার-বোট ভরাডুবি হয়। সেই বোটের অনেক সাহেবকে পরে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। এমন কি হতে পারে না যে সেই সাহেবদেরই একজন পরে বাঙালি পরিচয় দিয়ে, লালন হয়ে ওঠেন?' আমি তো শুনে অবাক! কিছুক্ষণ আমতা-আমতা করে, জিজ্ঞেস করলাম, 'লালন খামোখা ইংরেজ হতে যাবেন কেন?' ভদ্রলোক (তিনি একজন উকিল) কনফিডেন্টলি বললেন, 'ইংরেজ না হলে এতো বুদ্ধি ধরে কেউ?' আমি তো আরও হতভম্ব, কিন্তু সেই সঙ্গে কিছু চাপা উষ্মাও জমছে। বললাম, 'কিন্তু এ কথা আপনি বলছেন কিসের ভিত্তিতে?' উনি বললেন, 'ওই সময়কার পুলিশ রেকর্ড-এ এ রকম তথ্য পাওয়া যায়।' আমি ততক্ষণে বেশ উত্তেজিত বোধ করছি। নিজেকে যতদূর সম্ভব সামলে নিয়ে বললাম, 'তাই নাকি? তা কোথায় পাওয়া যাবে সেই নথিপত্র?' 'এই দ্যাখেন, গবেষক তো আপনি! সে আপনিই খুঁজে বার করেন গা!' বলে খুব একচোট হেসে নিলেন ভদ্রলোক।

লালন তাহলে ইংরাজ? হায়...কলোনিয়ালিজম-এর কি দোর্দণ্ডপ্রতাপ আজিও বিরাজে এ বঙ্গ-ভূমে! লালন বোধহয় জানতেন এমন হবে। কথায় কথায় তাই বোধহয় সাবেক সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে অষ্টাদশ শতকে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত 'স্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর তির্যক রেফারেন্স দিয়ে বলে ফেললেন,

আমার বাকির কাগজ গেল হুজুরে!
কোনদিন যেন আসবে শমন সাধের অন্তস্যপুরে...

লক্ষ্য করুন, 'শমন' শব্দটি কিন্তু ইংরেজি শব্দভাণ্ডার থেকে নেওয়া (summon)। অন্য একটি গানে (অবশ্য, তাঁর দেহতাত্ত্বিক অভিপ্রেত বজায় রেখেই) পাশাপাশি খবর দিয়েছেন,

করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে
শহরের ষোলজনা বোম্বেটে
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি
চোরের শিরমণি
নালিশ করিব আমি কার কাছে কার নিকটে?

৪

যে স্থানে শেষের শুরু,
শুরুর শেষ যেই স্থানে
সেই স্থানে আসিলাম মোরা
তোমারই সন্ধানে।।

২০০৫ থেকে ২০১২। তারও আগে, অনেকগুলো বছরের লালন-চর্চা, গান শোনা, শেখা, ভাবা ও গবেষণা। এত সবের পরেও বলতে কি পারব লালন তাহলে কার? বলতে চাইছি লালন আমার। বললামই না হয়, 'লালন আমার'। কিন্তু বললেই হল? আসলেই কি তাই?

কুষ্টিয়ার বলাই শাহ (তাঁর কথা আগেও বলেছি) আমায় একবার রবীন্দ্রনাথ ও লালন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, লালন শাহ নাকি একবার তরুণ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পাবলিক বেহারাদের দেখিয়ে বলেছিলেন, 'ওরে রবি, তুই আমারে আর কী কবি? তুই যাদের কাঁধে চড়িস, আমি তাদের পূজা করি!' এ ঘটনা আদৌ ঘটেছিল কিনা, লালন এমন কথা রবীন্দ্রনাথকে আদৌ বলে থাকতে পারেন কিনা, তার সত্যি-মিথ্যে যাচাইয়ের কোনো উপায় নেই, কারণ ইতিহাস আমাদের জানায় যে লালন মারা যাবার ২ মাস পর, মানে ১৮৯০-এর ডিসেম্বর মাসে, রবীন্দ্রনাথ পাকাপাকি ভাবে শিলাইদহের জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে কুষ্টিয়াতে আসেন। তবে তার আগে রবীন্দ্রনাথ যখন কুষ্টিয়াতে এসেছেন (পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে আসতেন সে কথা আমরা জানি), লালন ফকিরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েও থাকতে পারে, আবার না-ও হয়ে থাকতে পারে। এর ঠিক-বেঠিক আমরা কোনোদিনই জানব না। রবীন্দ্রনাথ নিজে তার কোনো অকাট্য প্রমাণ রেখে যান নি। অতএব, সে নির্ণয়ে না গিয়ে, বলাই শাহের উক্তিতে যে বোধটা প্রকাশ পায়, সেটা বোঝার চেষ্টা করাই বোধহয় বেশি জরুরি। ব্যাপারটা শুধু নাগরিক সভ্যতা আর গ্রাম সভ্যতার বিরোধের প্রশ্ন নয়, শ্রেণি-সংঘর্ষও নয়, এর মধ্যে রয়েছে মানব দেহে ঈশ্বর-সন্ধানের প্রয়াসের ভেতরে যে অন্তর্নিহিত ও একধরনের আত্মিক সাম্যবাদ কাজ করে, সেই আদর্শের প্রশ্ন। একদিকে মানবিকতা ও মানবতার দর্শন সামনে রেখে, অন্যদিকে শোষণশীল জমিদারি ব্যবস্থাকে জারি রাখার আপাতবিরোধ নয়, বা দূর থেকে 'ওরা কাজ করে' বলা নয়, একেবারে কাছে গিয়ে সেই সহায়-সম্বলহীন মানুষগুলোয় পায়ে গিয়ে পড়া। আমাদের পক্ষে কি আদতেই তা সম্ভব নাকি এ শুধুই বামপন্থী পার্টি-লাইন ধরার ব্যাপার? এই

প্রশ্নই বোধহয় সমূলে তুলে ধরছে বলাইয়ের উক্তি। বলাই বোধহয় রবি-বাবুকে নিয়ে এ গল্পের মধ্যে দিয়ে, ইঙ্গিতে আমাকেও ওই একই প্রশ্ন করছিলেন, বা হয়তো সতর্ক করে দিচ্ছিলেন।

২০০৮-এ বর্ষীয়ান ফকির বাদের শাহ (এঁর কথাও আগে বলেছি) রবীন্দ্রনাথ ও লালন প্রসঙ্গে আমাকে এক গল্প শোনান কুষ্টিয়াতে। এ গল্প তিনি নাকি শুনেছিলেন তাঁর গুরু-স্থানীয় কোনো এক ফকিরের কাছে, যিনি লালনকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন। একবার নাকি লালনকে রবি ঠাকুর কলকাতায় নিয়ে যান। কলকাতায় গিয়ে, রবিবাবু একটি বন্ধ ঘরে লালনকে ছয়জন সুন্দরী রমনীর সাহচর্যে রেখে চলে যান। রবীন্দ্রনাথ চলে যাওয়া মাত্রই মেয়েরা লক্ষ্য করেন যে শায়িত লালনের শরীর প্রাণহীন। রবি ঠাকুর আসতেই মেয়েরা তাঁকে এই খবর দিলেন। দেওয়ামাত্রই দেখা গেল, অবাক কাণ্ড, লালন পুনরুত্থিত হয়ে উঠে বসেছেন। গল্প শেষ করে বাদের শাহ বললেন, 'তাঁদের ফকিরি! বিরাট ব্যাপার বাবা! কিডা বোঝবে? আর কিডা করবে?' বাদের শাহ-র এই গল্প আমি একবার এক বক্তৃতায় বাজিয়ে শুনিয়েছিলাম। তা শুনে এক অগ্রজপ্রতীম লালন-গবেষক আমাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধমক দিয়েছিলেন এই বলে যে গল্পটি আমার জনসমক্ষে শোনান উচিত হয়নি, কারণ এতে নাকি ব-কলমে রবীন্দ্রনাথকে অপমান করা হয়, কারণ নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় নাকি নৃতত্ত্ববিদ্‌কে 'good informant' ও 'bad informant'-এর প্রভেদ বুঝে চলতে হয় এবং সেই প্রভেদ অনুযায়ী এই ধরনের মন্তব্যকে এড়িয়ে যেতে হয়। আমি সবিনয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম যে ক্ষেত্র-সমীক্ষায় যে রকম তথ্যই পাই না কেন আমাকে তো সেই তথ্যের প্রতি নিষ্ঠাবান হতেই হবে, তা আমার ব্যক্তিগত মত বা ধারণার সঙ্গে মিলুক বা না-মিলুক। সেই 'সত্য'-কে প্রতিষ্ঠিত করাই তো একজন নৃতত্ত্ববিদের কাজ।

রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে শিলাইদহের জমিদারি দেখাশোনা করার জন্য কুষ্টিয়ায় ছিলেন, সেই সময়কার একটি ছবির দিকে পাঠিকা/পাঠকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করছি। এই ছবিতে দেখি রবীন্দ্রনাথ সোজা দাঁড়িয়ে আছেন, ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে, আর তাঁর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন আট-দশ জন ক্ষেতমজুর প্রজা। রবীন্দ্রনাথের পিছনে একমাত্র একজন দাঁড়িয়ে — লম্বা চুল-ওয়ালা এক ব্যক্তি, যাঁকে দেখলে মনে লাঠিয়াল, খুব সম্ভবত জমিদার-বাবুর দেহরক্ষী। ইনি বাদে আর সবার দেহভঙ্গি সামাজিক অবস্থানগত বিনয়-প্রকাশের ঢঙে কিছুটা বাঁকা, কেউ বা করজোড়ে ভিক্ষাপ্রার্থী; বোঝা যায় তাঁরা যাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি তাঁদের

কর্তা-বিশেষ কেউ, এঁর একটি উচ্চারণে তাঁদের জীবনের অনেক কিছুই বদলে যেতে পারে। এঁদের মধ্যে (ছবির ডানদিকে ঘেঁষে) দাঁড়িয়ে আছেন এক দাড়ি-ওয়ালা বৃদ্ধ, পরনে লুঙ্গি আর কাঁধে আঁচলা-ঝোলা, চোখে অবাক-হওয়া দৃষ্টি। দেখলেই বোঝা যায় তিনি ফকির মানুষ। এই সব বাস্তব চরিত্রের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথকে রোমান্টিক 'রবি-বাউল' হিসেবে কল্পনা করা, গগণেন্দ্র ও অবনীন্দ্র যেমন করেছিলেন, কষ্টকর। বরং এ ফটোগ্রাফে রবীন্দ্রনাথের জমিদার রূপটিই বেশি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। এর দ্বারা আমি বলতে চাইছি না যে শিলাইদহের রবীন্দ্রনাথ স্বৈরাচারী বা অত্যাচারী জমিদার বিশেষ ছিলেন। কোনো ধরনের রোমান্টিকতায় না গিয়ে, শুধু বলতে চাইছি যে শিলাইদহের রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ঠাকুর বাড়ির জমিদারি এস্টেটের প্রতিভূ, যাঁর প্রধান কাজ ছিল প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা-আদায় ও তাদের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সদ্ভাব বজায় রাখা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে কারণে তাঁকে শিলাইদহের এস্টেট পরিচালনার দায়ভার দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, কলোনিয়াল যুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পরিকাঠামোর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল। কিন্তু ওই শোষণমূলক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও, তিনি পেরেছিলেন শ্রেণি গণ্ডি পার হয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ করে যেতে, যেহেতু তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রখর দূরদৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে লালন ফকিরের গানের বাণীকে মুদ্রণ জগতের আঙিনায় নিয়ে আসতে হবে, বৃহত্তর পাঠক সমাজের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটিয়ে দিতে (এ অবশ্য ভিন্ন এক প্রবন্ধের বিষয়, অতএব বিশদ-বিবরণে গেলাম না)। তাই লালনের আখড়া থেকে লালন-শিষ্যদের অনুলিখিত লালনের গানের দুটি খাতা 'ধার' করে, তুলে রেখে দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের আর্কাইভে। সে খাতাগুলি রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন ফেরৎ দেন নি; এবং তা নিয়ে কুষ্টিয়ার ফকির সমাজে আজও গভীর এক অভিমান রয়ে গিয়েছে। (যদিও তিন খণ্ডের 'লালন সঙ্গীত' সংকলনের সম্পাদক, মরহুম ফকির আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহ-র কাছে উনিশ শতকের আরো দুটি গানের খাতা রক্ষিত ছিল বলে আমার জানা আছে। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া খাতাগুলির বাইরেও তার আরও অন্তত দুটি কপি ছেঁউড়িয়ার ফকিরদের কাছে বরাবরই ছিল।) তবে রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত খাতার মূল্য ছিল অপরিসীম, কারণ ওখান থেকেই বেছে নিয়ে, তার পাঠোদ্ধার ও বানান-সংশোধন করে, লালনের গান, আজ থেকে একশো বছর আগে, তিনিই কলকাতায় প্রথম প্রকাশ করিয়েছিলেন। বাংলার বাউল-ফকির সম্প্রদায়ের মরমী

কাব্যধারার এক মহাকবিকে পরিচিত করিয়েছিলেন মুদ্রিত সাহিত্যের মূলধারায়। লোকজ ও মৌখিক (বা প্রায়-মৌখিক) পরম্পরায় কাব্যকে স্থায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন মুদ্রিত হরফে। সে নেহাৎ কম কথা নয়; কারণ লালনের গান সংগ্রহ ও ছাপার ধারা বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে চালু না হলে, আজ অনেক গানই হয়তো হারিয়ে যেত। কিন্তু তার বাইরে, একশো বছর আগের ওই কলোনিয়াল পরিমণ্ডলে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না সামন্ততন্ত্রের পরিকাঠামো ভেঙে আর তেমন বৈপ্লবিক কিছু করার। রবীন্দ্রনাথ নৃতত্ত্ববিদ্ ছিলেন না।

কিন্তু আজকের গণতান্ত্রিক ও প্রোগ্রেসিভ যুগে? শহুরে, শিক্ষিত ও সেই অর্থে priviledged, বিত্তশীল মানুষ হয়েও আমরা কি এখনো সত্যিই পারি না, গবেষণা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে, নিজেদের সমস্ত শ্রেণি খর্বতা নিয়েই (কিন্তু ছেঁদো রোমান্টিকতার বাইরে এসে), প্রণত থাকতে সাঁইজীর পদকমলে? যাতে সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও তাঁর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারি সামনে? মনে কি রাখতে পারি না, যে —

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে জাতের বিচার নাই।।

শহুরে শিক্ষিত উচ্চারণে মেকি ঠেকলেও কথাগুলি আমার কাছে সত্যি। এই অনন্য সাধারণ মানুষটি প্রতিষ্ঠানের বাইরে ও বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছেন 'এ ইমারতে কাজ নেই', অথচ পাশাপাশি গড়তে চাননি কোনো পাল্টা প্রতিষ্ঠানের বিবাদী ইমারত। পার্থিব ও শরীরী লালসার বাইরে গিয়ে, লালন তাঁর ঈশ্বরের খোঁজ করেছেন মানুষেরই মধ্যে, এ মানব-শরীরের ভিতরকার মহাজগতে। এই খোঁজের পথে তিনি শ্রেণি-ভাগ, ধর্ম-ভেদ ভুলে, মানুষকে আনতে চেয়েছেন মানুষের কাছে, শাসককে বলেছেন শাসনহীন হতে, পুরুষকে হতে বলেছেন পৌরুষহীন, লিঙ্গতন্ত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে পুরুষকে করেছেন নারীর অনুগামী।

লিঙ্গ থাকিলে সে কি পুরুষ হয়।
বার মাস চব্বিশ পক্ষ, তবু কেন ঘর খালি রয়।।

দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে দাবি করেছেন —

লালন বলে গুপ্ত মক্কা — আদি ইমাম তার মেয়ে
আছে আদি মক্কা এই মানব দেহে, দেখ না রে মন ভয়ে।।

এখানেই জিতে গেছেন লালন। আর তাঁর এই জয় চিনতে না পারার, তাঁর বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত ও চিন্তাকে নিজেদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে না পারার ব্যর্থতা আমাদের সকলের।

পরিশেষে তাহলে লালন লালনেরই থেকে যান। গানের বাণীতে তিনি হয়তো বলছেন,

ফকির লালন ভেড়োর দিন গিয়াছে
যে বাঁচবে সে দেখবে রে ভাই।।
আজগুবী বৈরাগ্য লীলা দেখতে পাই...

কিন্তু লালনের মতো 'ভেড়োর' দিন আসলে যায় না, যাবেও না। আসলে তো কিছু হারায় না, আমরা দেখতে পাই না বলে ধরে নিই হারিয়ে গেছে; শরীরের মাপ বদলেছে না মেনে, বলি জামা ছোট হয়ে গেছে। লালন ফকিরের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা কতকটা সেরকমই। তাই এ কথা মনে রেখে আমাদের নিরন্তর চেষ্টা করে খুঁজে যেতে হবে লালনকে, বারবার ডুব-সাঁতার দিয়ে যেতে হবে তাঁর গানের গহনে। সেই অতল ছেনে তুলে আনতে হবে মণি-মানিক্য। তাঁকে দেখতে হবে, জানতে হবে অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে, তাঁকে ছুঁয়ে থাকতে হবে। তাঁর দরশ-পরশের ওই লেশটুকু পেলেই আমরা ভাগ্যবতী।

...

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় নাট্যগবেষক, লেখক, অভিনেতা, নির্দেশক। বর্তমানে তিনি ইংল্যান্ডের লাফবসরো বিশ্ববিদ্যালয়ে ড্রামার সিনিয়র লেকচারার। এর আগে তিনি আমেরিকায়, বার্কলীতে পড়াতেন। এই প্রবন্ধের একটি ক্ষুদ্রতর পূর্বরূপ, কলকাতা থেকে প্রকাশিত, প্রতিদিন পত্রিকার 'রোববার' ক্রোড়পত্রে মুদ্রিত হয়েছিল, অক্টোবর ২০১০-এ।

পরিশিষ্ট

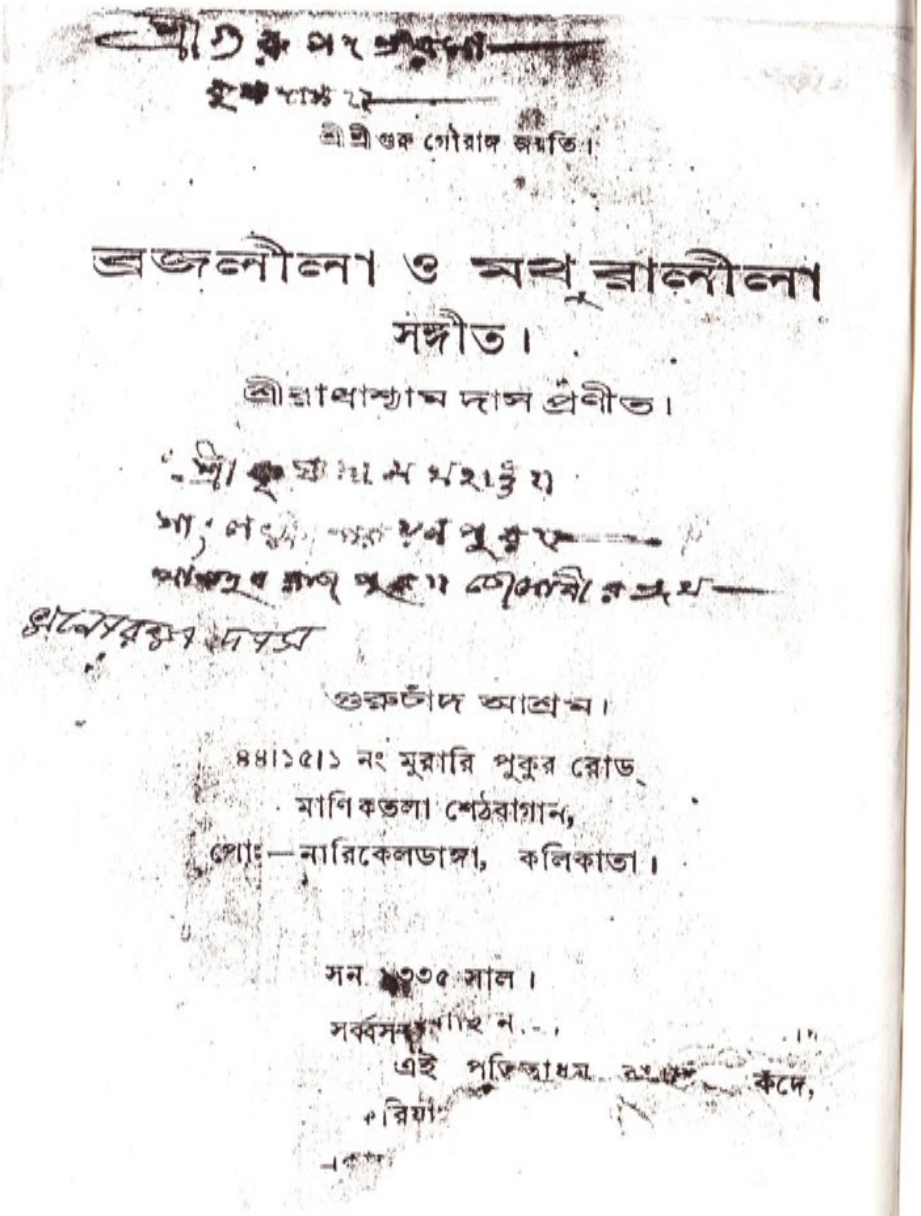

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ জয়তি।

ব্রজলীলা ও মথুরালীলা
সঙ্গীত।

শ্রীরাধাশ্যাম দাস প্রণীত।

গুরুচাঁদ আশ্রম।
৪৪।১৫।১ নং মুরারি পুকুর রোড,
মাণিকতলা শেঠবাগান,
পোঃ—নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।

সন ১৩৩৫ সাল।

পরিচিতি : রাধাশ্যাম দাস

বীরভূম জেলার অন্তর্গত আমোদপুর রেলস্টেশনের উত্তর-পূর্ব কোণ বরাবর তিন চার মাইল দূরে দেয়াশচাঁদপুর গ্রাম। সমগ্র বীরভূম জুড়ে নানা অঞ্চলে উনত্রিশটি সুগঠিত আশ্রম খ্যাপা মা গড়েছিলেন। দেয়াশচাঁদপুর তাদের মধ্যে একটি।

রাধাশ্যাম দাসের পূজ্যপাদ গুরুদেব গুরুচাঁদ গোস্বামী দেয়াশচাঁদপুর আশ্রমে থাকতেন। গুরুচাঁদ গোস্বামী সেই আশ্রমেই সাধনভজন করতেন। 'ভাবসঙ্গীত' নামে গানের পুস্তকটি গুরুদেব গুরুচাঁদের ইচ্ছাতেই প্রকাশিত। সেই গানের পুস্তকে রাধাশ্যামের জন্মতারিখ নেই। বাং ১৩৩৯ সালে তাঁর 'ভাবসঙ্গীত' গানের একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। পুস্তকটিতে ১নং ঠিকানা 'গুরুচাঁদ আশ্রম', গ্রাম ইন্দাস, পো বিপ্রটিকরি, জেলা - বীরভূম লেখা আছে।

রাধাশ্যাম দাসের বাবার নাম ছিল হরিদাস মহন্ত। মায়ের নাম লেখা নেই।

কবিতার আকারে রাধাশ্যাম লিখেছেন —

একে তো বালক বুদ্ধি, স্থির নহে মন,
শুদ্ধাশুদ্ধি দোষ না লবেন সাধুগন,
বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন, বাতুলের প্রায় —
বামন হয়ে গগন ধরিবারে চায়,
তবে গুরুচাঁদ গোঁসাই মোর কৃপার সাগর।
নিজে গুণে কৃপা করিলেন অধম পামর।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবের আমি আশ্রিত দাস

এই প্রার্থনা যেনো হয় না লোক উপহাস।
বৈষ্ণব গোঁসাইর করি চরণ বন্দন,
সবে মিলি কর কৃপা, হোক বাঞ্ছা পূরণ।
কৃষ্ণ ভক্তি লাভের আশে এ সকল সঙ্গীত রচনা
পড়িয়ে, শুনিয়ে, গাহিয়ে আশীর্বাদ করিবেন সাধুজনা।
বহুদিন অবধি, মনে বড়ই সাধ,
আশা পূর্ণ করহ গোসাঁঞি ক্ষম অপরাধ।
বীরভূম জন্মভূম, গ্রামের নাম ইন্দাস,
শ্রীশ্রী হরিদাস মহন্ত জীউর পুত্র, জ্ঞানহীন শ্রী রাধাশ্যাম দাস।

রাধাশ্যাম দাস বাউল সাধক ছিলেন না, তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। গানগুলির অধিকাংশ মনোশিক্ষা, গৌরচন্দ্রিকায় এবং গুরুতত্ত্ব বিষয়ে লেখা। প্রায় প্রতিটি গানেই গৌরঙ্গের কথা। বৈষ্ণব বিনয়ের আঙ্গিকে লেখা মনোশিক্ষার গানও আছে।

কোটাসুরে খ্যাপা মায়ের যে আশ্রম সেখানে প্রতি বছর ভাদ্র মাসের ১৫ তারিখ বাউল বৈরাগীদের সারারাত ধরে গান হত। মচ্ছপ চলত দু'দিন ধ'রে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাউল বৈষ্ণবরা এসে মচ্ছপে অংশ নিতেন। আমি দু'তিন বার সেখানকার অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। 'দিদিভাই' নামে পত্রিকা সেখান থেকে ছাপা হয়। সন্তু সেনগুপ্ত কর্ণধার। আশ্রমের সামান্য অংশ বর্তমানে আছে। বাকি জমিজমা বিক্রি হয়ে গেছে।

— প্রশান্ত চন্দ্র রায়
অশোকনগর, উ ২৪ পরগণা

সূচিপত্র

ব্রজলীলা

১। নদীয়া ছাড়িয়া গেল হায়।
২। আমারে ত্যজিয়া মথুরা ...
৩। আর উতলা হওনা প্যারী ...
৪। হৃদয় পিঞ্জরের পাখী ...
৫। শুন ধনি বিধুমুখি ...
৬। চিরদিন যারে ভালবাসি ...
৭। ফিরে আস্‌বে না আর ...
৮। বঁধু ছাড়ি গেল মধুপুর ...
৯। রাই ধনি হে, এখন আর ...
১০। প্রেম করা সই, ...
১১। যদি প্রেম কর্‌বি রাই ...
১২। এবার আমি যোগিনী হব ...
১৩। মদন মোহন অদর্শনে ...
১৪। এনে দেখা, বাঁকা সখা ...
১৫। এ বিপদে কোথায় আছনাথ
১৬। আজ প্রাণ গোবিন্দে ...

মথুরালীলা

১৭। মধুপুর বাসিনী ...
১৮। শ্যামাচরণ পাখী ...
১৯। হে ধর্ম্ম অবতার ...
২০। কেহ ধনি বিদেশিনি ...
২১। চিন্‌বে কি হে চিকণকালা
২২। ওহে বৃন্দে আর অকারণ ...
২৩। ভাল বাঁকায় বাঁকায় ...
২৪। উচিত কথা বস্‌লে পরে ...
২৫। আগে না জেনে শুনে ...
২৬। বিদায় দাও হে ...
২৭। শ্যাম তুমি আর ব্রজে যেওনা
২৮। কুব্জা হে! ব্রজে যাব ...
২৯। আজ আবেশেতে শ্যাম ...
৩০। আজ বহুদিনের পরে দেখা
৩১। রাধা দরশনে যাবে যদি শ্যাম
৩২। বহুদিনের পরে প্রাণ বঁধুয়া
৩৩। রাধা-গোবিন্দের যুগল মিলন ...

শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ জয়তি।

প্রথম খণ্ড।

ব্রজলীলা।

১নং গীত — গৌর চন্দ্রিকা।

১। নদীয়া ছাড়িয়া গেল হায়!
দেখ গোরা যায়।

২। নদেপুরী আঁধার করি,
আবার কোথায় হ'ল উদয়।।

৩। গৌরচন্দ্র গেলেন ছেড়ে, সংসার পরিত্যাগ ক'রে,
সোণার নদে থাকল প'ড়ে, শচী মাতা রইলেন নিদ্রায়।।

৪। নদেবাসী অচেতনে, নিদ্রায় মগন সর্ব্ব জনে,
বিষ্ণুপ্রিয়ায় রেখে শয়নে, আপনার মনে চ'লে যায়।।

৫। কাঁদিছেন গদাধর শ্রীবাস, অদ্বৈত আর হরিদাস,
নিত্যানন্দ হ'য়ে হুতাস, শচীমাতার মুখ পানে চায়।।

৬। প্রেমে ভেসেছিল নদে, ভাসাইলে গৌর ভক্ত কেঁদে,
না হেরে গোঁসাই গুরুচাঁদে
(দাস) রাধাশ্যাম খেদে কয়

২নং গীত — শ্রীমতীর উক্তি।

১। আমারে ত্যজিয়া মথুরা, গেছে গো প্রিয়া!

২। প্রিয়া বিনা হিয়া আমার, যায় ত সখি ফাটিয়া।।

৩। মধুপুর নাগরী, শুনেছি পণ্ডিত ভারী;
তবে কেন অবিচারি, রাখ্‌লে বঁধু ধরিয়া।।

৪। কি ব'লব্ গো দারুণ বিধি, আমারে হইল বাদী,
কৃষ্ণ হেন গুণনিধি, দিয়ে নিল হরিয়া।।

৫। কৃষ্ণের বিরহানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে;
সে অনল নিভায় না জলে, দ্বিগুণ উঠে জ্বলিয়া।।

৬। গোসাঁই গুরুচাঁদ তাই ব'ল্‌ছেন স্পষ্ট,
রাধাশ্যাম তোর দুরদৃষ্ট,
ওরে দুষ্ট পাবি কষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ না ভজিয়া।।

৩নং গীত — সখির উক্তি।

১। আর উতলা হ'ও না প্যারি, থাক ধৈর্য্য ধরি।

২। বিরস বদন দেখে তোমার, আমরা যে প্রাণে মরি।।

৩। ধনি, তুমি থাক স'য়ে, আমরা থাকি তোমায় নিয়ে,
থাকুক দুদিন রাজা হ'য়ে, সে প্রজা ত তোমারি।।

৪। যাক্‌না কেন কোথায় যাবে, আবার ব্রজে আস্‌তে হবে,
সকল কষ্ট দূরে যাবে, আগমনে শ্রীহরি।।

৫। যাব আমি মধু ভুবন, আনিতে সেই বংশীবদন;
মিছে কেন কর রোদন, ওহে ব্রজ সুন্দরী।।

৬। (গোসাঁই) গুরুচাঁদ তাই, ব'লছেন ডেকে,
কৃপা করি রাধাশ্যামকে,
ধ'র্‌বি যদি সেই অধরকে, থাক্‌গেরে জ্যান্তে মরি।।

৪নং গীত — শ্রীমতীর উক্তি।

১। হৃদয় পিঞ্জরের পাখী, ফাঁকি দিয়ে গেছে উড়ে।

২। পাখীর জন্য ওগো সখি, দিবানিশি আঁখি ঝরে।।

৩। গেছে পাখী যেদিন হ'তে, সুখ নাহি মম চিতে,
শুনেছি সেই মথুরাতে, আছে গো যমুনা পারে।।

৪। পালিলাম যতন করিয়ে, প্রেম সুধারস খাওয়াইয়ে;
কে জানে যে মজাইয়ে কাঁদায়ে যাবে আমার।।

৫। অধিক কথা ব'লব বা কি, শিক্‌লি কাটা কুটিল পাখী,
স্বচক্ষেতে দেখ দেখি, শূন্য পিঞ্জর আছে প'ড়ে।।

৬। রাধাশ্যাম দাসের নিবেদন, বল কিসে জুড়াই জীবন;
গোসাঁই গুরুচাঁদের চরণ, দরশন পাব কি ক'রে।।

৫নং গীত — সখির উক্তি।

১। শুন ধনি বিধুমুখি, আর কি পাখী আস্‌বে ফিরে।

২। মনোকষ্টে শিক্‌লি কেটে, গেছে ছুটে দেশান্তরে।।

৩। প্রেম সুধারস খাওয়াইতে, ক্ষুধা তাঁর মেটে নাই তাতে;
রাখ্‌তে পূরে পিঞ্জরেতে, থাক্‌ত সে মরমে মরে।।

৪। থাক্‌ত যদি ভালবাসা, হ'ত না আর এ দুর্দ্দশা;
পেয়েছে খুব উচ্চবাসা, আশাধারী কুব্জার ঘরে।

৫। স্বভাব কুটিল চিরকাল, কিন্তু পাখীর নামটি ভাল;
না জানি কোন দেশে গেল, অবলার প্রাণ উদাস ক'রে।।

৬। পাখীর নামটি মনোরাখা, ত্রিলোকের মন রাখে একা;
(দাস) রাধাশ্যাম তুই, হলিরে বোকা,
গোসাঁই গুরুচাঁদ বিস্তারে।।

৬নং গীত — শ্রীমতীর উক্তি।

১। (আমি) চিরদিন যারে, ভালবাসি তারে, ভুলিব কেমনে

২। ভুলি ভুলি করি, ভুলিতে না পারি,
সদাই হেরি শয়নে স্বপনে।।

৩। আমার জীবন, যৌবন, মনোপ্রাণ অর্পণ,
ক'রেছি সেই জনে।
আমার মনের কথা মন জানে, আর গোবিন্দ জানে।।

৪। পাই মরমেতে ব্যাথা, প্রাণনাথের কথা,
যখন পড়ে মনে।
(আমার) ভালবাসার ভাল, ভাবি চিরকাল, মঙ্গল কারণে।।

৫। সইরে, না হলে আপন, পরের বেদন, পরে কি জানে?
ভেবে দেখ মনে, আপন আপন স্থানে,
পিরীতে সবাই টানে।।

৬। দাস রাধাশ্যামের মন, হ'ল উচাটন,
গোসাঁই গুরুচাঁদ বিহনে।
যেন অন্তিমকালে দেখা, পাই প্রাণসখ্য, নিবেদন চরণে।।

৭নং গীত — সখির উক্তি।

১। ফিরে আসবে কি আর বৃন্দাবনে, বৃন্দাবন শ্যাম।
২। এখন মোদের দুরদৃষ্ট কৃষ্ণ হয়েছে বাম।।
৩। যেদিন মথুরায় গেল,
কা'ল আস্‌ব' বলেছিল;
আসি ব'লে নাহি এল, এই ব্রজধাম।।
৪। চ'ড়ে অক্রূরের রথে,
গিয়াছে মথুরাতে;
ম'জেছে কুব্জার প্রেমেতে,
সেই গুণধাম।।
৫। কালা তোর কি কাল হ'ল
কা'ল ব'লে মধুপুর গেল;
সোণার অঙ্গ হ'ল কাল,
ভেবে অবিরাম।।
৬। ভুলেছে ভালবাসা,
বৃথা তাঁর কর আশা;
(গোসাঁই) গুরুচাঁদের চরণ ভরসা,
করে রাধাশ্যাম।।

৮নং গীত — শ্রীমতীর উক্তি।

১। বঁধু ছাড়ি গেল মধুপুর (প্রাণ সখিরে)।
২। বল্‌গো তোরা সেই মথুরা,
এই ব্রজ ছাড়া কত দূর।।
৩। (প্রাণ) বঁধুর কুশল শুন্‌তে পাই না,
কেউ কি যায় না আসে না?
বঁধুর মত আর দেখি না,
সে যে এমন নিষ্ঠুর।।
৪। ধিক্ বলি ওরে বিধি,
দিয়ে কেন হ'লি বাদী?
তাই হ'রে নিল গুণনিধি,
ব্রজে আসিয়ে অক্রূর।।
৫। প্রেম তরু রোপন ক'রে,
যুগল পল্লব হ'ল নারে;
ভাঙ্গিল প্রেম অঙ্কুরে,
বাড়িল দুঃখের অঙ্কুর।।
৬। (গোসাঁই) গুরুচাঁদের চরণ ধূলা,
(পেলে) রাধাশ্যামের জুড়ায় জ্বালা,
গুরুচাঁদের প্রেমলীলা,
(সে যে) বড়ই সুমধুর।।

৯নং গীত — সখির উক্তি।

১। রাই ধনি হে!
এখন আর কাঁদি অকারণ!

২। পূর্ব্ব স্মৃতি হে শ্রীমতি!
হয়েছ কি বিস্মরণ।।

৩। গোলকেতে বিরজার দ্বারে,
শ্রীদামকে অভিশাপ দিলে বিচার না ক'রে।
শ্রীদাম কৃষ্ণ সঙ্গ যারে ছেড়ে,
ব'ল্লে তারে এই বচন।।

৪। পরের মন্দ করা উচিত নয়,
পরের মন্দ ক'রতে গেলে আপনার মন্দ হয়।
(আবার) শ্রীদাম যে শাপ দিলে তোমায়,
শত বৎসর হারাইবে কৃষ্ণধন।।

৫। ধনি, তোমায় বলিহে স্পষ্ট,
উচিত কথা ব'ল্‌ব কিন্তু, হবে হও রুষ্ট।
দেখ কত কষ্ট পেয়ে কৃষ্ণ,
গিয়াছে মধু ভুবন।।

৬। আমার গোসাঁই গুরুচাঁদ রচে
(দাস) রাধাশ্যাম তুই আপন দোষে, প'ড়েছিস্ প্যাঁচে।
তোর পাকা ঘুটি গেল কেঁচে,
চিন্‌লিনা পরশ রতন।।

১০নং গীত — শ্রীমতীর উক্তি।

১। প্রেম করা সই, আমার হ'ল না।

২। পোড়া বিধি আমার বাদী হ'লরে,
হ'তে দিলে না।।

৩। প্রেমের অঙ্কুর হ'তেছিল,
অঙ্কুরেতেই ভেঙ্গে গেল,
যুগল পল্লব হ'তে পেলে না;—
কৃষ্ণ প্রেম অমিয় ফল
মম ভাগ্যে ফ'ল্‌ল না।।

৪। আমার হৃদয় আকাশের চন্দ্র,
পূর্ণ চন্দ্র প্রাণ গোবিন্দ,
উদয় হ'ল কোথায় দেখনা;—
প্রতিপদের চন্দ্র যেমন,
কেউ দেখ্‌লে কেউ দেখ্‌লে না।।

৫। কৃষ্ণ প্রেম সুধা সিন্ধু,
কল্লোলের এক বিন্দু,
সে বিন্দুর এক বিন্দু পেলাম্ না;—
সেই বিন্দুর কণা পেলে পরে, যেত বাসনা।।

৬। খেদেতে দাস রাধাশ্যাম কয়,
কে বলে তায় করুণাময়,
এমন নিঠুর আরত দেখি না;—
গোসাঁই গুরুচাঁদের রাঙ্গা চরণ,
পেয়েও পেলাম না।।

১১নং গীত — সখির উক্তি।

১। (যদি) প্রেম ক'র্‌বি রাই! সুপুরুষ জেনে;
আয়, বলি কথা গোপনে।

২। সুপুরুষের প্রেম, জাম্বুনদ হেম;
জ্যোতি বাড়ে তার দিনে দিনে।।

৩। শুন ধনি! প্রেমের রীত, সে পিরীতি ভাঙ্গে নাত,
কি অদ্ভুত পিরীতি জানে;—
যেমতি মৃণালের সূত, ভাঙ্গলেও যোগ রয় তার সনে।

৪। সকল সময়েতে নাই ঋতু বসন্ত,
সকল পুরুষ নারী, নহে গুণবন্ত।
বলিগো, প্রেমের চরিত্র, শুন একান্ত মনে।।

৫। সুজনার প্রেম কাঁচা সোণা।
সে প্রেম ত ভেঙ্গেও ভাঙ্গে না।
সে পিরীতির এম্‌নি রীতি বাড়ে বই কমেনা —
কুজনার প্রেম কাঁচের বাসন, ভাঙ্গলে জোড়া না মানে।।

৬। গোসাঁই গুরুচাঁদের এই বাণী,
সকল কণ্ঠেতে নাই সুমধুর ধ্বনি।
ওরে রাধা শ্যাম, প্রেম ক'র্‌বি শুনি,
ধ'রগারে রসিক চিনে।।

১২নং গীত — শ্রীমতীর উক্তি।

১। এবার আমি যোগিনী হব। (প্রাণ সখিরে!)।

২। প্রতি জনে জনে আমি, প্রাণ নাথের কথা শুধাইব।।

৩। গেছে প্রিয়া যেদিন হ'তে, পাইনা কুশল শুনিতে;
আস্‌বার আশে আশাপথে, আর কতদিন চেয়ে রব।।

৪। প্রিয়া আমার কোন্ দেশে, যাব আমি সেই উদ্দেশে;
রবনা আর এ ছার বাসে, যোগিনীর বেশে ভ্রমিব।।

৫। বঁধুর বিরহচিতে জ্বল্‌ছে হিয়ার মাঝারেতে;
দেখা পেলে প্রাণ নাথে, এ দেহেতে প্রাণ পাব।।

৬। রাধাশ্যাম দাসেতে ভণে, এ জ্বালা সহেনা প্রাণে;
(গোসাঁই) গুরুচাঁদের শীতল চরণে,
তাপিত প্রাণ জুড়াইব।।

১৩নং গীত — সখির উক্তি।

১। মদন মোহন অদর্শনে বিরহে রাই প্রাণে ম'ল।

২। প্রেমেরি বিচ্ছেদ অনল,
কি দিয়ে তায় নিভায় বল।।

৩। সুখময় বিনা শুকসারী,
আর যে ময়ূর ময়ূরী;
বিরহে সুখ নাই কাহারি,
তমালে কাঁদে কোকিল।।

৪। বিরহে চকোর চকোরী,
আর যে ভ্রমর ভ্রমরী,
তাদের বহে চক্ষে বারি,
লতা বৃক্ষ তাও শুকাইল।।

৫। শ্যামলী ধবলী যত,
তাদের দশা ব'ল্‌ব কত;
বিরহে ব্যাকুল চিত,
প্রাণ মাত্র আছে সম্বল।।

৬। (একদিন) ঘিরেছিল দাবানলে,
তায় রক্ষা পেলাম সকলে;
এখন যে বিরহানলে,
ব্রজাঙ্গনার প্রাণ দগ্ধ হ'ল।।

৭। সখিভাবে রাধাশ্যাম বলে,
গুরুচাঁদ হে কি করিলে!
আজ ব্রজ গোপীর নয়ন জলে,
যমুনার জল প্রবল হ'ল।।

১৪নং গীত — শ্রীমতীর উক্তি।

১। (একবার) এনে দেখা, প্রাণ সখা ও সহচরি।

২। বঁধুর বিচ্ছেদ জ্বালা,
সইতে না পারি।।

৩। প্রাণনাথ বিনে, বলগো কেমনে,
থাকি ধৈর্য্য ধরি।
এই যে মদনানলে,
অঙ্গ সদাই দহিছে আমারি।।

৪। আমার হয় মনে মনে,
বঁধুর অন্বেষণে যাই মধুপুরী।
গিয়ে আপন জোরে, আনি তাঁরে —
বাঁকা বংশীধারী।।

৫। কা'ল আসি ব'লে গেল,
ফিরে নাহি এল, ভুলে রইল শ্রীহরি,
বুঝি, প্রিয়ার মনকে, ভুলায়েছে মথুরা নাগরী।।

৬। ওগো বৃন্দে, একবার এনে দে, হৃদয়-বিহারী।
বলে রাধাশ্যাম খেদে,
গোসাঁই গুরুচাঁদের চরণ আশা-ধারী।।

১৫নং গীত — সখির উক্তি।

১। এ বিপদে কোথায় আছ নাথ!
বিপদ ভঞ্জন মধুসূদন।

২। ওহে ব্রজের জীবন রাধারমণ,
রাধায় কিসে বাঁচাই এখন।।

৩। একেতে অবলা বালা,
সহেনা বিরহজ্বালা;
রক্ষা কর ওহে কালা,
রাজবালা রাধার জীবন।।

৪। নীল পদ্মের মালা গলে,
পরাইলাম জুড়াইবে ব'লে;
"গরুড় রক্ষা কর" বলে,
"কালীয়া আমায় করে দংশন"।।

৫। কোকিলের কুহু-স্বরে,
বক্ষে যেন বজ্র পড়ে,
জৈমিনী স্মরণ ক'রে,
ধুলায় প'ড়ে হয় অচেতন।।

৬। রাধাশ্যাম দাসেতে ভণে,
গুরুচাঁদের বিরহাগুণে;
এবার বুঝিম'লাম প্রাণে,
দিনে আঁধার আজ বৃন্দাবন।।

১৬নং গীত — বৃন্দের উক্তি।

১। আজ প্রাণ গোবিন্দে, আন্‌তে বৃন্দে, চ'ল্‌ল মথুরায়।

২। দধি দুগ্ধ মাখন ছাড়া, সাজায়ে পশরায়।।

৩। হাস্য বদন দেখাও এখন, গা তোলহে রাই।
শুভযাত্রা করি, চরণ ধূলি,
দে গো মোর মাথায়।।

৪। সেই মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে, খুঁজে দেখ্‌ব তায়।
পেলে আপন জোরে, বাঁধ্‌ব তারে, খতের বাকীর দায়।।

৫। না হয় নূতন রাজা হয়েছে এখন, গিয়ে মথুরায়।
মোদের রাধারাণীর কৃপায়, ভয় করি না কুবুজায়।।

৬। দাস রাধাশ্যামের বাণী,
বৃন্দে ধনী যমুনা পার যায়।
বৃন্দে উত্তরিল, যথায় ছিল, নিঠুর শ্যামরায়।।

মথুরা-লীলা।

১৭নং গীত। বৃন্দের উক্তি।

১। মধুপুরবাসিনী! দেখেছ কি ধনি?
শ্যামাবরণখানি, পাখী এসেছে উড়ে।

২। লোকমুখে শুনি, কুব্জা নামে রাণী;
শুনেছি সেই ধনী, পাখী রেখেছে ধ'রে।।

৩। মনোচোরা পাখী কমলিনী ধরে,
প্রেম শিকলে বেঁধে রেখেছিল তারে।
রাধা রাধা বুলি শিখাইলাম যত্ন করে,
রাই পিঞ্জর শূন্য ক'রে এসেছে মধুপুরে।।

৪। সে পাখীর গুণের কথা কি ব'লব তোমারে,
পাখীর জন্যে ধনী সদাই রোদন করে।
কেবল সেই পাখীর তরে, এলাম যমুনা পারে,
এইবার পেলে তারে, আর দিব না ছেড়ে।।

৫। সে পাখীর চিহ্ন আছে মাথায় ময়ূর পাখা,
পাখায় আছে — রাধার নাম তাহে লেখা।
উরু ভুরু বাঁকা, অঙ্গভঙ্গী বাঁকা,
আছে তাঁর নয়ন বাঁকা, চিনে তায় নিব ধ'রে।।

৬। দাস রাধাশ্যাম বলে, পাখীর করি গো অন্বেষণ,
আর কত দিনে পাব সেই পাখীর দরশন।
পাখীর দেখা পেলে, এ দেহে আসে জীবন,
দেখ্‌ব সে পাখী কেমন বাঁধব্‌ প্রেম-ভক্তিডোরে।।

১৮নং গীত। মথুরাবাসীনীর উক্তি।

১। শ্যামাবরণ পাখী, কুব্জা দেখি,
প্রেম ফাঁদে পাখী ধ'রেছে।

২। অতি যতনে ক'রে, কুব্জা তারে
হৃদয় পিঞ্জরে রেখেছে।।

৩। যমুনা পার হতে, এল মধুপুরে,
সেইদিনে মোরা দেখেছি তারে;
চাও যদি যাও রাজদরবারে,
সে যে এখন রাজা হ'য়েছে।।

৪। পাখীর রূপেতে মন হরে,
এমন পাখী দেখি নাই সংসারে,
যার পাখী তারে অনাথিনী ক'রে,
শিকলি কেটে উড়ে এসেছে।।

৫। শিক্‌লি কেটে গেলে উড়ে,
আর কি ধরা যায় গো তারে।
পিঞ্জরে আবদ্ধ কোরে,
কেউ কি রাখ্‌তে পেরেছে।।

৬। গোসাঁই গুরুচাঁদ বলে মনোচোরা পাখী,
(ওরে) রাধাশ্যাম তোরে দিয়েছে ফাঁকি;
ফিরে তাঁরে আর পাবি কি?
বিদেশিনীর ফাঁদে পড়েছে।।

১৯নং গীত। বৃন্দের উক্তি

১। হে ধর্ম্ম-অবতার, কর হে বিচার, জানাই তোমারে।

২। ব্রজপুরে ডাকাতি ক'রে এসেছে এ পারে।।

৩। রাধারাণীর রঙমহলে, ছিল সে ভাণ্ডারে;
কিছুদিন পরে, খাস তবিল মেরে, গেছে ব্রজ ছেড়ে।।

৪। ধনহারা হ'য়ে কাঁদিছে ধনী ধূলাতে প'ড়ে।।
আমি সেই উদ্দেশে ফিরি দেশে দেশে,
যদি নাগাল পাই তারে।।

৫। তার অঙ্গ বাঁকা, ভঙ্গি বাঁকা নয়ন বাঁকা;
মাথার চূড়া বাঁকা, ময়ূর পাখায়
রাধানামে লেখা উপরে।।

৬। শুনেছি হে পরম্পরে এসেছে মধুপুরে।
আছে কুব্জা নামে রাণী, চিরকাঙ্গালিনী,
রেখেছে সে ধ'রে।।

৭। দাস রাধাশ্যাম বলে, সেই চোরে পেলে
বাঁধব প্রেম ডোরে।
গোসাঁই গুরুচাঁদের কৃপায় এবার পেলে তায়,
দিব না আর ছেড়ে।।

২০নং গীত। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

১। কেহে ধনি! বিদেশিনি, কাঙ্গালিনীর বেশেতে।

২। কোন প্রয়োজন কিসের কারণ
আগমন রাজসভাতে।।

৩। বল বল শীঘ্রগতি, কিবা নাম, কোথায় বসতি;
একাকিনী অবলা জাতি; সাথী নাই কেউ সঙ্গেতে।।

৪। আমি হে মথুরার রাজন্, সূক্ষ্ম বিচার কর্‌ব এখন;
বল তুমি সত্য বচন, আমার এই সাক্ষাতে।।

৫। দয়াময় নামটি ধরি,
ভক্তে ডাক্‌লে কি রহইতে পারি?
অসুর নিধন আমি করি,
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে।।

৬। দাস রাধাশ্যাম কয়, জানাও দরখাস্ত,
বিচারে হবে বন্দোবস্ত, সাজা পায় অপরাধী যত,
(গোসাঁই) গুরুচাঁদের দরবারেতে।।

২১নং গীত। বৃন্দের উক্তি

১। চিন্‌বে কি হে চিকনকালা!
নুতন রাজা হ'য়েছ।

২। সেদিন তোমার নাই হে মনে,
গোধন চরা ভুলেছ।।

৩। ভেবে দেখ দেখি মনে,
মানের দায়ে বৃন্দাবনে,
ধ'রে রাধার শ্রীচরণে সেধেছ আর কেঁদেছ।।

৪। বইতে হরি! নন্দের বাধা,
মায়ের কাছে থাক্‌তে বাঁধা,
নিধুবনে রাজা রাধার, কোটাল গিরি ক'রেছ।।

৫। দরিদ্র বিষয় পেলে,
ধনমদে থাকে ভুলে;
রাখাল ছিলে রাজা হ'লে,
সুখ-সাগরে ভাস্‌তেছ।।

৬। (গোসাঁই) গুরুচাঁদের চরণ ধরে,
দাস রাধাশ্যাম কয় রাজ-দরবারে,
ভাসায়ে দুঃখের সাগরে,
কুব্জার প্রেমে মজেছ।।

২২নং গীত। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

১। ওহে বৃন্দে। আর অকারণ নিন্দে ক'র না।

২। ভালবাসার কি দুর্দ্দশা গেছে হে জানা।

৩। (দেখ) বৃন্দাবনের বনে বনে,
কত কষ্ট পাই সেখানে,
সখা ব'লে রাখালগণে, পেলাম যন্ত্রনা।।

৪। প্রেমের দায়ে নন্দের ঘরে,
পায়ের বাধা বইলাম শিরে,
মা যশোদা বাধে করে, সইতে পারি না।।

৫। (আমায়) রাই প্রেমের চাকরী দিয়ে,
কতবার ধরাইলে পায়ে;
তোমরা আমায় একলা পেয়ে, করলে লাঞ্ছনা।।

৬। পতি ভাবে সুর্পনখা,
আমায় ভেবে হ'ল বাকা;
এখন সোজা হ'ল পেয়ে বাকা, চেয়ে দেখ না।।

৭। বিশ্বশ্রবা মুনির কন্যে,
কুব্জা নাম হ'ল এখানে,
(দাস) রাধাশ্যাম ভণে, ক্ষেদ রইল মনে, পূর্ণ হ'ল না।

২৩নং গীত। বৃন্দার উক্তি

১। ভাল বাঁকায় বাঁকায় মিলেছে হে
ও প্রাণসখা।

২। যেমন তোমার কুব্জা বাঁকা,
তেম্‌নি হে শ্যাম তুমি বাঁকা।।

৩। তোমার কুব্জা রাণী, রসিকিনী ধনি,
মধুর বাণী কয় রসে মাখা।
যেমন আরসলাকে যাদু করে
ধ'রে কুম্‌রে পোকা।।

৪। অদৃষ্টের লিখন না যায় খণ্ডন,
বিধির লিখন পাষাণের রেখা।
এসব ফ'ল্‌তে হবে কালে কালে,
আছে চর্ম্মে ঢাকা।।

৫। যদি এলাম মথুরায়, ওহে শ্যামরায়!
তোমায় বহু ভাগ্যে পেলাম দেখা।
তোমার কুব্জা মিলন, হেরে এখন,
ঘুচ্‌লে মনের ধোঁকা।।

৬। (গোসাঁই) গুরুচাঁদের শক্তি,
(দাস) রাধাশ্যামের উক্তি,
শাস্ত্র যুক্তি করি ব্যাখ্যা।
(একবার) ভেবে দেখ মনে,
দুয়ের মন কেমনে,
রাখিবে মন রাখা।

২৪নং গীত। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

১। উচিত কথা বল্‌লে পরে,
বন্ধু কিন্তু ব্যাজার হয়।

২। না বল্লেও বাঁচি না প্রাণে,
বল্‌তে কথা লাগে ভয়।।

৩। বল্‌লে থাকে না বাকি,
হ'য়ে যাবে পাকাপাকি,
তোমার আর কথাতে কাজ কি,
পেয়েছি হে পরিচয়।

৪। চ'ট নাহে বল্‌লে পরে,
ভেবে দেখ দেখি অন্তরে,
যত বুদ্ধি ঘোলের ভাঁড়ে, তার কথা কি প্রাণে সয়।।

৫। বিদ্যা বুদ্ধি গেছে জানা,
মুখ ফলে তার ক্ষেত ফলে না,
ভুয়ো জারি আর ক'র না বেড়ো না হে অতিশয়।।

৬। কর যদি বাড়াবাড়ি
ভাঙ্গব তোমার ঘোলের হাঁড়ি
নাচ দুয়ারে গড়াগড়ি, ছড়াছড়ি হবে নিশ্চয়।।

৭। (দাস) রাধাশ্যাম কয় দোষ দিব কার,
কর্ম্মফলে ঘটে আমার,
বদন ভ'রে ব'লব এবার, গোসাঁই গুরুচাঁদের জয়।।

২৫নং গীত, বৃন্দের উক্তি।

১। আগে না জেনে শুনে, বিদেশীর সনে
প্রেম করা উচিত নয়।

২। প্রেমিক ভিন্ন প্রেম জানে না,
জানিলাম নিশ্চয়।।

৩। অপ্রেমিকের সঙ্গে প্রেম, কাঁদিতে যে হয়।
(যেমন) চোরা না মানে ধর্ম্মকাহিনী
নাহিক সরম ভয়।।

৪। দয়া মায়া নাই অন্তরে কঠিন হৃদয়।
প্রেম-বিচ্ছেদ চিতে, মন পোড়ায় তাতে,
নিষ্ঠুর অতিশয়।।

৫। প্রেম পিরীতি, সরল রীতি, সকলেতে কয়।
(এবার) মনচোরার হাতে প'ড়ে,
আমার জীবন সংশয়।।

৬। দাস রাধাশ্যাম ভণে, এই ছিল মনে,
ওহে দয়াময়!
(তোমার) শুনেছিলাম শ্যাম দয়াময় নাম
দিলে ভাল পরিচয়।।

২৬নং গীত, শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

১। বিদায় দাও হে কুব্জা সুন্দরী! যাই ব্রজপুরী।

২। তোমারি কারণে আমার আগমন মধুপুরী।।

৩। তোমার সঙ্গে সত্য ছিল,
এখন সত্য পূর্ণ হ'ল,
ভাল কিম্বা মন্দ বল, বল হে প্রাণেশ্বরী।।

৪। কংস রাজায় ধ্বংস ক'রে,
রাজা হ'লাম মধুপুরে,
আমার যে পিতা মাতারে, কারাগারে উদ্ধার করি।।

৫। শুন বলি, হে প্রেয়সি!
তুমি ছিলে কংসের দাসী,
তোমারে করি মহিষী, বসেছি বামে করি।।

৬। দাস রাধাশ্যাম কয় বিনয়েতে,
দাও হে বিদায় সরল চিতে;
(গোসাঁই) গুরুচাঁদের চরণেতে,
ঘাট্ হয়েছে আমারি।।

২৭নং গীত, কুব্জার উক্তি।

১। শ্যাম তুমি আর ব্রজে যেও না,
তোমায় করি মানা।

২। প্রাণ থাকিতে কোন মতে
বিদায় দিতে পারব না।।

৩। তুমি হে হৃদয় বিহারী,
এস নাথ হৃদে ধরি,
বহুদিনের আশাধারী, আশায় নৈরাশ ক'র না।।

৪। আসিয়ে দুদিনের তরে,
মজাইলে হরি আমারে,
বিদায় মাগ কেমন ক'রে, সরম কিহে হ'ল না।।

৫। প্রথম মিলন কালে,
কত ছলে ভুলাইলে,
কুব্জা তোমার হ'লাম বলে, লুটীলে হে ষোল আনা।।

৬। এই কি তোমার প্রেমের ধারা,
অবলার প্রাণ দগ্ধ করা,
তোমার সঙ্গ হ'লে ছাড়া, আর ত প্রাণে বাঁচব না।।

৭। গোসাঁই গুরুচাঁদে বলে,
পড়লাম বড়ই গণ্ডগোলে,
(দাস) রাধাশ্যামরে তোর কপালে, ছিল এত যন্ত্রনা।।

২৮নং গীত, শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

১। কুব্জা হে! ব্রজে যাব আর নিষেধ
ক'র না আমায়।

২। যাব আমি বৃন্দাবনে,
সরল মনে দাও হে বিদায়।।

৩। যে জন্যে মথুরায় এলাম,
সে কার্য্য সমাধা ক'রলাম,
ভক্তের বাঞ্ছা পুরাইলাম, রাজা হ'লাম এই মথুরায়।।

৪। ছিলে তুমি কুঁজেশ্বরী,
এখন ত পরম সুন্দরী,
সত্য কিনা ও সুন্দরি, প্রকাশ করি বল হেথায়।।

৫। বদন তোল কও হে কথা,
কেন দাও প্রাণে ব্যথা,
মান করেছ বৃথা, সে মান কি তোমায় শোভা পায়।।

৬। রাধাশ্যাম দাসের এই বাণী,
শুন হে কুব্জারাণী,
ব্রজের অমঙ্গল শুনি, মনো যে ব্রজে যেতে চায়।।

২৯নং গীত, আবেশে ব্রজে প্রত্যাগমন।

১। আজ আবেশেতে শ্যাম, শ্রীরাধার ধাম
উত্তরিল আসি।

২। দূতী মুখে শুনি সমাচার,
চঞ্চল হইল কালশশী।।

৩। নাগর যায় পীতধড়া পরিতে পরিতে,
অবসর নাই নিতে বাঁশী।
নুপুর পরিতে পায়, সময় নাহি পায়,
ব'লব কি বেশী।।

৪। চূড়া বাঁধিতে রহিল, তিলক মুড়া হ'ল,
মলিন হ'ল মুখচন্দ্রশশী।
শ্যাম ধায় যথা রাধা, না মানে বাধা,
সঙ্গে বৃন্দে দাসী।।

৫। ধায় যেন নাগর, নব জলধর,
নাহি ঠাওর দিবা কি নিশি।
যেন চাতকের পিপাসা, নিবারিতে আশা,
উদয় হাঁসি হাঁসি।।

৬। ব্রজপুরে মৃত তরু মুঞ্জরে,
ষড় ঋতু বসন্ত প্রকাশি।
দাস রাধাশ্যাম কহে, প্রাণ এল দেহে
প্রেমানন্দে ভাসি।

সখি সম্মিলন।

৩০নং গীত, সখিগণের উক্তি।

১। আজ বহুদিনের পরে দেখা, ও চিকন কা'ল।

২। ব্রজপুর ছেড়ে মধুপুরে শ্যাম ছিলে ত ভাল।।

৩। তোমারি কুশলে সকলি কুশল,
বঁধু হে! তব কুশল বল।
তোমার কুশল বাণী শুনে, জুড়াই হে পরাণে,
নিভাই দুঃখের অনল।।

৪। প্রাণনাথ বিনে সবে অনাথিনী,
প্রাণমাত্র কেবল সম্বল।
এ প্রাণ গেলে দেখা হ'ত না হে,
ভাগ্যে দেখা ছিল।।

৫। (আজ) হারাণ রতন পেয়ে সর্ব্বজন,
বৃন্দাবন আনন্দে ভরিল।
নাচে ময়ূর ময়ূরী, আর শুক শারী,
গান করে কোকিল।।

৬। দাস রাধাশ্যাম ভণে, ব্রজধামে
শ্যাম-চাঁদের উদয় হ'ল।
সুখময়ের আগমনে, মনের দুঃখ দূরে গেল।।

বৃন্দের চতুরালী।

৩১নং গীত, বৃন্দের উক্তি।

১। রাধা দরশনে যাবে যদি শ্যাম,
রাধা নাম সদা জপ না হে।

২। ওহে বাঁকা শ্যাম, জপ অবিরাম,
রাধা নাম যেন ভুল না হে।

৩। ওহে শ্যাম! তোমায় বড় ভালবাসি,
কিন্তু বৃন্দে আমি রাধাদাসী।
বল্‌ব কি বেশী, ওহে কালশশী!
রাধা নামে বাঁশী বাজাও না হে।।

৪। পীত ধড়া পর রাজবেশ ছেড়ে,
চূড়া বাঁধ মুকুট ফেলাওহে দুরে।
বিনোদ বেশটি ধরে না গেলে পরে,
বিনোদিনী কথা কবে না হে।।

৫। ভাঙ্গা গড়া কাজ করি হে হরি,
ভাঙ্গতেও পারি গ'ড়তেও পারি।
আমি ভাল পারি প্রেমের কারিকুরি,
কত ভাবে করি ঘটনা হে।।

৬। বৃন্দে চলিল সঙ্গে লয়ে কানাই,
যথা বসে আছে বিরহিনী রাই।
দাস রাধাশ্যাম বলে, গুরুচাঁদ গোসাঁই,
(যেন) চরণ ছাড়া আমায় ক'র না হে।।

মিলন।

৩২নং গীত — শ্রীমতির উক্তি।

১। বহুদিনের পরে প্রাণ বঁধুহে! এলে ঘরে।

২। দেখা কি আর হ'ত হে বঁধু!
পরাণ গেলে পরে।।

৩। কুশল কি ব'লব তোমাকে,
দুঃখিনীর দিন গেল দুঃখে;
তুমি ত ভাল ছিলে হে সুখে, সেই মথুরা নগরে।।

৪। ময়ূর নৃত্য কর এসে,
কোকিল গাও তমালে ব'সে;
ভ্রমরা তার সঙ্গে মিশে, গান কর গুণ গুণস্বরে।।

৫। ব্রজের জীবন কালবরণ,
শত বর্ষ পরে পদার্পণ;
হারাণ ধন পেয়ে দর্শন, মৃত তরুগণ মুঞ্জরে।।

৬। দাস রাধাশ্যাম কয় কি আনন্দ,
ব্রজে উদয় প্রাণগোবিন্দ;
দূরে গেল নিরানন্দ, রাধাগোবিন্দ যুগল হেরে।।

৩৩নং গীত, যুগল মিলন।

১। (আজ) রাধা-গোবিন্দের যুগল মিলন,
হেররে নয়ন ভ'রে।

২। কাল মেঘের কোলে সৌদামিনী
যেমন শোভা করে।।

৩। কি শোভা হয়েছে নিকুঞ্জবনে,
রাধাগোবিন্দ একাসনে।
রতন সিংহাসনে, দুঁহু জন বিরাজ করে।।

৪। দুঁহু রূপে গুণে সমান সমান,
প্রেমময়ী রাধা কামময় শ্যাম।
একটি মাত্র প্রাণ, রাধা আর শ্যাম,
ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধরে।।

৫। চাঁদের পাশে যেমন চকোর,
রাই চাঁদের পাশে তেমনি নাগর।
শ্যাম নাগর মত্ত নিরন্তর, সোমরস মধু পান ক'রে।।

৬। সখিগণ ঘেরি ঘেরি দাঁড়ায়,
ললিতা বিশাখা চামর ঢুলায়।
ময়ুর নাচে গাছে, ভ্রমরে তান যোগায়,
কোকিল গায় পঞ্চম স্বরে।।

৭। রাধা গোবিন্দের মিলন হ'ল,
বদন ভরে হরি হরি বল।
রাধাশ্যাম দাসের জনম সফল হ'ল,
(গোসাঁই) গুরুচাঁদের চরণ ধরে।।

সমাপ্ত।

with best wishes from

"শীতের সঙ্গ 'বাউলের ছন্দে' ..."
আমার বঙ্গ নাচুক আনন্দে।"

S.P. Group of Companies
Kolkata - 700 035

---

with best wishes from

Amod Dasgupta

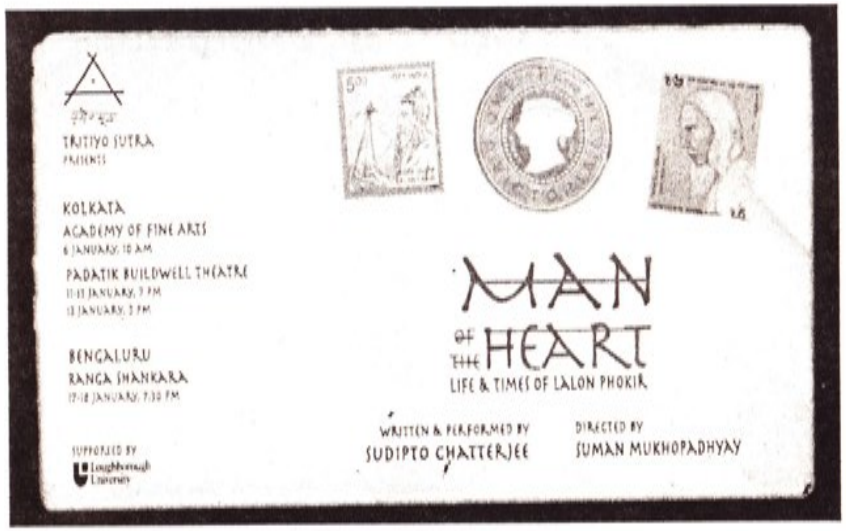

TRITIYO SUTRA
PRESENTS
KOLKATA
ACADEMY OF FINE ARTS
6 JANUARY, 10 AM
PADATIK BUILDWELL THEATRE
BENGALURU
RANGA SHANKARA
17-18 JANUARY, 7:30 PM
SUPPORTED BY
Loughborough University
MAN OF THE HEART
LIFE & TIMES OF LALON PHOKIR
WRITTEN & PERFORMED BY
SUDIPTO CHATTERJEE
DIRECTED BY
SUMAN MUKHOPADHYAY

[illegible]